বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচিতি

Introduction to Bangladesh Economy

ইউনিট ১

ভূমিকা

দূর অতীত হতেই ভারতীয় উপমহাদেশ আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা ও সম্পদে সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিলো। তখনকার সময়ের এ অঞ্চলের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাধিক গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে আছে। চীন, কোরিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষার্থে এখানে ভিড় করতো। ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা শহরের চল্লিশ মাইল দূরে বড়গাঁও নামক গ্রামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিলো। এখানে পড়ানো হতো চতুর্বেদ্দ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্প বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতে নালন্দার পর পরই খ্যাতির অধিকারী হচ্ছে বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন মগধের নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে এটি স্থাপন করেন পাল রাজবংশের রাজা ধর্মপাল। এখানেও ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা হতো। এভাবে ক্রমান্বয়ে বলভি, সারনাথ এবং পাহাড়পুর বিহার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সারনাথেই বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে মুসলমান সুলতানদের অবদানও স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এর শাসনামলকে প্রাক্-মুঘল আমলের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসরতার কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ অঞ্চলের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিলো। আর সে কারণেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চাপিয়ে দিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে ১৯০ বছর। এরপর পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিম পাকিস্তানও পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ২৪ বছর। তাদের উভয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবহার হয়েছে এ অঞ্চলের লুণ্ঠিত সম্পদ। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ নামক ভূ-খন্ডটি। যুদ্ধে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপুল জনসংখ্যার চাপ, সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতার কারণে যদিও বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি তারপরও অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এদেশের কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী শ্রমিকদের কল্যাণে পোশাক শিল্পের প্রসার, মানব সম্পদ রপ্তানি এবং বর্তমানে অগ্রসরমান বেসরকারি খাতের প্রসার ও তথ্য প্রযুক্তির সহজ ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ। দারিদ্র্য বিমোচনসহ জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় সমাদৃত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১: বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাঠ ১.২: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

পাঠ ১.৩: বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা

পাঠ ১.৪: বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান

পাঠ ১.১

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি
Historic Background of Bangladesh Economy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব অর্থনৈতিক পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন সংযোজন ঘটে 'বাংলাদেশ' নামক সার্বভৌম ভূখন্ডের। এর পূর্বে এই ভূখন্ড পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ২৪ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে, তারও পূর্বে সমগ্র ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকে ছিল ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অধীনে ১৯০ বছর। এখানেই ইতিহাস শেষ নয়। প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। ঘন ঘন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এ অঞ্চলের সীমানাও বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। হিমালয় হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এ অঞ্চলের উত্তর অংশ বরেন্দ্র ও পুন্ড্র, দক্ষিণ অংশ হরিকেল ও সমতট, পূর্ব অংশ বঙ্গাল, পশ্চিম অংশে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং উত্তর-পশ্চিমের কিছু অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান যুগে এ অঞ্চলের নাম বাঙ্গালা বা বাংলা নামে অভিহিত হয়। তবে এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৭১ সালের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম দেশটিকে 'ভূ-খন্ড' বলা হয়েছে।

ভূখন্ড → ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি → ব্রিটিশ শাসনামল → পাকিস্তানি শাসনামল → বাংলাদেশ

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

সুপ্রাচীনকাল হতে এ ভূখন্ডের জনগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। বর্তমানে যে ধরনের হাল, লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হয় তখনও সে রকম ছিল। কোনো কোনো জায়গায় হালের গরুর পরিবর্তে জমি চাষের সময় পরিবারের পুরুষ বা মহিলা সদস্যরা শ্রম দিত। সমাজ ব্যবস্থা ছিল কৃষিনির্ভর। সমাজ সংগঠনের একক ছিল গ্রাম। গ্রামীণ জীবনের যে সামান্য চাহিদা তা গ্রামেই মেটাবার ব্যবস্থা ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্লভ ক্রিমিজাম (রেশম) শিল্পসহ বিভিন্ন বস্ত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদেও ঐ সময়ের অর্থনীতির স্বরূপ জানা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রায় ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এরূপ কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। অনেকে এ সময়কে **আদি ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি** হিসেবে অভিহিত করেন। তখন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়নি।

মৌর্য যুগ হতে শুরু করে গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ বিভিন্ন সময় অতিক্রম হওয়ার পরও এ ভূখন্ডের ভূমি ও চাষাবাদের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখনকার সময় ভূমির মালিক ছিল রাজা, জমি চাষ করার জন্য কর দিত কৃষক। গুপ্ত যুগ কৃষিনির্ভর হলেও কুটির শিল্প বিশেষ করে কার্পাসনির্ভর বস্ত্রে ছিল সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ কুটির শিল্প ও সুদক্ষ কারুশিল্পী ছিল এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তখন এখানে আখ হতে চিনি উৎপাদন এবং রপ্তানি হতো। এছাড়া মৃৎ শিল্প, হাতির দাঁতের শিল্প, তাম্র-কাঁসাসহ মিশ্র ধাতুশিল্পেও সমৃদ্ধ ছিল এ অঞ্চল। এছাড়া যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নৌ-শিল্পেও এ অঞ্চলের একটি স্থান ছিল। মসলিন এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন শিল্প এবং তার খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। বস্ত্র ছাড়াও তখন এ অঞ্চল হতে মুক্তা, তেজপাতা কিছু কিছু কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি হতো। ঐ সময়ে দেশ বিদেশের সাথে বিভিন্ন রকম ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল বলেই বিদেশ হতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা আমদানি হতো।

১২০০ হতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চলে **মুসলিম যুগের শাসনামল** লক্ষ করা যায়। ইতিহাসে এ সময়কে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময়ে নৌ-শিল্পের কিছুটা প্রসার ঘটে। রণতরীসহ পালতোলা যাত্রীবাহী বিভিন্ন ধরনের নৌকা

এসময় তৈরী হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নও এসময় হয়েছিল। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে শামছুদ্দিন ফিরোজশাহ বিনিময় প্রথা রহিত করে সোনারগাঁয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন। বখ্‌তিয়ার-এর বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এ ভূখন্ডের অর্থনীতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধ্যযুগে শেরশাহের আমলে সমগ্র রাজত্বকে কতগুলো সরকার এবং পরগণায় বিভক্ত করা হয়। তখন জমির উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা হিসাবে কৃষকরা দিত। বাদশা আকবরের আমলে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা টোডরমল এ অঞ্চলের রাজস্ব বন্দোবস্তের তালিকা প্রস্তুত করেন।

মোগল বাদশাহ'র আমলে জায়গীরদাররা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদার। তবে এ অঞ্চল নদীমাতৃক ছিল বলে এখানে দীর্ঘকাল কোনো নির্দিষ্ট দাবি বহাল রাখা যেত না। তাই সামান্য ইজারাদারী প্রথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। দিল্লির বাদশাহী শাসন যখন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল তখন উপমহাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ ভূখন্ডেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারা প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হতে থাকলো। তখন প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা, রাজস্ব আদায়কারীরাও জমিদার হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করতেন। জমিদাররা শতকরা দশভাগ রাষ্ট্রকে সেলামি দিত। এ ইজারা চলতে থাকে বংশানুক্রমে। সে সময় সমাজ ব্যবস্থার উপর দৃঢ়ভাবে চেপে ছিল নানান স্তরে বিন্যস্ত সামন্ত প্রভুর দল।

মোগল আমলের কিছু পূর্ব থেকেই ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলার মাটিতে বিদেশি বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি বণিকরা এ ভূখন্ডে ব্যবসার ক্ষেত্রে সূত্রপাত ঘটায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে তখন প্রচুর পরিমাণ সোনা, রুপা আমদানি হওয়ায় এখানকার নবাব দিল্লির বাদশাকে নগদ অর্থে সেলামি দিত। সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশ দেয় যে, এ অঞ্চলে প্রত্যেক নতুন সুবেদার নিয়োগের সময় সম্রাটকে দশ লক্ষ টাকা সেলামি দিতে হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সম্রাট সুবেদারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সুবেদার শায়েস্তা খান[১] সম্রাটকে তিন লক্ষ টাকার উপহার ও চার লক্ষ টাকার মণি-মাণিক্য দিয়েছিলেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শায়েস্তা খাঁর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ নেয়, সুবেদার সে টাকা আর কোনোদিন ফেরত পায়নি। এসব কিছুই ছিল নির্ধারিত দেয় রাজস্বের উপরি। তারপরও সুবেদার ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতেন। শায়েস্তা খাঁ আঠার বছর সুবেদারী করে নয় কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। খাঁন জাহান করেছিলেন এক বছরে দুই কোটি টাকা। শায়েস্তা খাঁর আমলে ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া গিয়েছিল।

বিদেশি বণিকদের এ ভূখন্ডে আগমন[২]

বিদেশি বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ ভূখন্ডে আসে পর্তুগিজরা। পর্তুগিজদের পর আসে ওলন্দাজরা। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ওলন্দাজ জাহাজ এ ভূখন্ডে নোঙর করে। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ অধিকৃত হুগলির পত্তন হয়। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার সুযোগ পায় এবং ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা প্রথম কারখানা স্থাপন করে।

ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর এ অঞ্চলের দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি। দেওয়ানি লাভের পূর্বে তারা ব্যবসায় করে মুনাফা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিত। দেওয়ানি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাদের মুনাফার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময়কার এ অঞ্চলের রাজস্বের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সন	আমল	এ ভূখন্ডের রাজস্বের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৫৮২	টোডরমল	১০৬.৯৩
১৭২৮	সুজা খাঁ[৩]	১৪২.৪৬
১৭৯০	ব্রিটিশ কোম্পানি	২২০.০০

---

১. শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮) : বাংলার মুগল সুবাহদার। ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের সামান্য বেশি সময়ের বিরতিসহ দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলার সুবাহদার হিসেবে তাঁর কার্যকালই ছিলো দীর্ঘতম।−বাংলাপিডিয়া, ১২ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১১।

২. অজয় রায় : বাংলাদেশের অর্থনীতি

৩. সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান : বাংলার নওয়াব (১৭২৭ থেকে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)−বাংলাপিডিয়া, ১৩ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১১

কোম্পানি রাজস্ব আয় আদায় করত কিছু ঠিকাদারের মাধ্যমে। এ ঠিকাদাররা এদেশের চাষিদের কাছ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রাজস্ব আদায় করত এবং অর্থ অংকে স্ফীত হতো। তাদের রাজস্ব আদায়ের জুলুম অত্যাচারে এ অঞ্চলের অনেক কৃষক ভিটে-মাটি ছাড়া হলো। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে যে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এ অঞ্চলে, বিশেষ করে ময়মনসিংহে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিদ্রোহের ফকির ও সন্ন্যাসীরা ছিল মূলত ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদকৃত কৃষক। তখন ভেরেলেস্ট (১৭৬৭-৬৯ খ্রি.) ও কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে বঙ্গদেশের গভর্নর এবং মীর জাফরের পুত্র 'নাজিম-উদ্-দৌলা' (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.) নায়েব ছিলেন। ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি গ্রহণের পর দ্বৈত শাসনের অত্যাচারে, কোম্পানির শোষণে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ১৭৬৮ সালে অনাবৃষ্টির কারণে ফসল ভালো না হওয়ায় ১৭৬৯ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ১৭৭০ সনে (বাংলা ১১৭৬ সাল) সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল, প্রায় ৩৩ ভাগ জমি অনাবাদিতে রূপান্তরিত হয়। তখন টাকায় এক মণ চালের স্থলে তিন সের পাওয়া গিয়েছিল। অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি ১৬ জনে ৬ জন। প্রায় এক দশক এই দুর্ভিক্ষের চরম ফল সমাজজীবনে ভোগ করতে হয়। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এসময়ে এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়।[৪]

ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন অর্থনীতিতে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। প্রথম দিকে ইংরেজরা সস্তায় কুটির শিল্পজাত-পণ্য কিনে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করত, ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য উচ্চমূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করতো। এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনোরকমে টিকে ছিল। কিন্তু চরম আঘাত আসলো ১৮১৩ সালে হাউস অব কমন্স এ ভারত হতে ইউরোপে পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করে আইন পাস, কিছু পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর। শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ডে বয়ন শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটে। তখন এ ভূখন্ড হতে আমদানিকৃত কাপড়ের উপর চড়া শুল্ক ধার্য করলো, পরবর্তীতে তাঁত শিল্পসহ অন্যান্য কুটির শিল্প জোর করে ধ্বংস করা হলো। এ অঞ্চলের তাঁতীদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেয়ার ইতিহাস সুবিদিত ধারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজরা নীলচাষ শুরু করে। নীল চাষাবাদের কাজে জনগণকে জোর করে বাধ্য করা হলো। ফলে কৃষকরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

ইংরেজ শাসনামলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। সেই শিক্ষা ইংরেজদের মতোই শোষণ ও নেতৃত্বের অনুসারী শ্রেণি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে এই শিক্ষিত জনগণই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ধীরে ধীরে জনগণকে সংঘটিত করে।

পাকিস্তানি শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত হলো পাকিস্তান। সবাই ভেবেছিল, প্রায় দু'শ বছরের গণ্যানি ও ভয়াবহতা ভুলে গিয়ে প্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে, মানুষ সুখের মুখ দেখবে। কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সবক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে। এ ভূখন্ডে তথা পূর্বপাকিস্তানে পাট, তুলাসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সবই উৎপাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসস্থল ছিল এ অঞ্চল তথা পূর্বপাকিস্তান। কিন্তু শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদন সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ব্রিটিশ শাসনামলের মতো পাকিস্তানিরাও এদেশ হতে শিল্পের কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য চড়া দামে এখানে বিক্রি করতো। ফলে ২৪ বছরেও এদেশের মানুষ শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক **বৈষম্য ও শোষণের তুলনামূলক চিত্র :***

---

৪. অজয় রায় : বাংলাদেশের অর্থনীতি

* । A Measure of Economic Growth in East and in West Pakistan—S. U. Khan, Staff Economist, The Institute of Development Economics.
। Pakistan Period (1947-71)—Abdur Rahman Chowdhury, a former official of the United Nations.
। Bangladesh Liberation War, 1971—Alburuj Razzaq Rahman.
। From East Pakistan to Bangladesh.
। Pakistan Planning Commission.

১। ভৌগোলিক ব্যবধান : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার বা ১০০০ মাইল। দুটো অঞ্চলের মাঝে অন্য একটি স্বাধীন দেশ– ভারত।

২। জনসংখ্যা ও প্রদেশ : পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ, যথা– পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান (Balochistan) এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (North-west Frontier). পূর্ব পাকিস্তান হলো পাকিস্তানের পঞ্চম প্রদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪% হলো পূর্ব পাকিস্তানে অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ সমগ্র পাকিস্তানে কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৩। কৃষি ক্ষেত্র : পূর্ব পাকিস্তান ছিল কৃষিতে উদ্বৃত্তাঞ্চল অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে তখন ঘাটতি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান উৎপাদিত পণ্য পাট (তখন বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ ভাগ আসতো এ খাত হতে), পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তুলা। ১৯৬৪-৬৫ এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের ৫৮ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ ভাগ কৃষির অবদান।

৪। ব্যাংকিং ও অর্থায়নের নিয়ন্ত্রণ : ১৯৪৭ এ দেশ বিভাজনের পর মুসলিম মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ বোম্বে হতে করাচিতে (পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী) স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যে বিনিয়োগ হয় তা আসে পশ্চিম পাকিস্তান হতে। আন্তর্জাতিকভাবে তখন চাহিদা ক্রমহ্রাসমান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ হয়–পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে। পশ্চিম পাকিস্তানের আদমজী পরিবার নারায়ণগঞ্জে পৃথিবী বিখ্যাত পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করে।

৫। জাতীয় ও মাথাপিছু আয় : ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা।*

১৯৪৯-৫০ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বছরে ০.৭ ভাগ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা ০.৩ ভাগ হারে কমতে শুরু করে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এসময়ে তা ২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্বপাকিস্তানের GNI ছিল ১৯৯৯ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ২৩৭৯ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তখন তা ছিল ৫০০ টাকা।

৬। নিয়োগ বা কর্মসংস্থান : দেশ বিভাজনের পর পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ পদস্থ প্রায় বেশিরভাগ কর্মকর্তা (গভর্নর জেনারেলসহ) পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণ বা ভারত থেকে আগত বিহারী শরণার্থী (refugees) যারা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বে উচ্চ পদস্থ পদে আসীন হতে পারেননি, এরা ছিলো শুধু প্রান্তিক শ্রেণির কর্মচারী।

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে অর্থ ও প্রতিরক্ষা খাতে উচ্চ পদসমূহ, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, কর্পোরেশনের প্রধান পদসমূহ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে ছিলো এমনকি পূর্বপাকিস্তান অংশেরও এই পদসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো।

পাকিস্তান আমলে গৃহীত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈষম্যের চিত্র :

উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ (১৯৫৫-৭০) **(কোটি টাকা)**

পরিকল্পনা ও সময়	পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)	পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)	মোট বরাদ্দে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০)	৩৩৬	৭২২	৩২
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬০-৬৫)	৯৭০	১৮৬০	৩৪
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০)	১৬৭০	২৬১০	৩৯
মোট	২৯৭৬	৫১৯২	৩৭

Ref: East Pakistan Planning Department : Disparities between East Pakistan and West Pakistan.

* Gustar F. Papanek – "Pakistan's Development : Social Goals and Private Incentives." 1967

৭। **প্রবৃদ্ধির হার :** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেকেই ভেবেছিল পাকিস্তানের দুই খন্ড একে অপরের বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে তা অর্জিত হয়নি। GNP এর প্রবৃদ্ধির হার ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব অংশে ১.৭%, পশ্চিম অংশে ৩.৬% যা ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.২% ও ৬.২% ।

৮। **অন্যান্য ক্ষেত্র :** (ক) পূর্ব পাকিস্তান মোট রপ্তানির ৭০% পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেও প্রাপ্ত আয়ের মাত্র ২৫% গ্রহণ করতে পেরেছে।

(খ) ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের কল ছিলো ১১টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৯টি। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে হয় ১৫০টি। বিনিয়োগের বেশিরভাগ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক।

(গ) পাকিস্তানের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি আয়ে উদ্বৃত্ত ভোগ করলেও এ উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর হতো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে বার্ষিক ২১০ মিলিয়ন অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করতো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তা ১০০ মিলিয়ন ছিলো। উন্নয়ন বাজেটের ৬২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে, ১৭ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং ২১ ভাগ অব্যবহৃত ছিলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়।

(ঘ) ১৯৫০-৫১ হতে ১৯৫৯-৬০ এ দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য এসেছিল ৯৩ কোটি টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এ সময়ে সাহায্য গ্রহণ করেছে ৪০৮ কোটি টাকা।

(ঙ) ১৯৫০-৫১ হতে ১৯৬৯-৭০ এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৩০.৩ ও ১৯৪৭.৬ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯২৬.১ ও ৪১৯১.৮ কোটি টাকা।

(চ) পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তান ২.৬ বিলিয়ন ডলার সম্পদ পাচার করে।

(ছ) ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিহত হয়। তখন যে সাহায্য আসে তাও পশ্চিম পাকিস্তানিরা আত্মস্যাৎ করে।

(জ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১% ও ৩৫% পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়।

(ঝ) পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তান ছিলো এক্ষেত্রে উপেক্ষিত।

(ঞ) পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবারের হাতে সম্পদের বেশির ভাগ চলে যেতো। আর পূর্ব পাকিস্তানিরা দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রে পরিণত হতো।

ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানি শাসনামলের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ ভূখন্ডের মানুষ আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হতে থাকে। ক্রমাগত কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কৃষি ও শিল্পখাতের আওতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি অপেক্ষা শিল্পখাতের অবদান পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় দৃশ্যমানভাবে দেশীয় পরিকল্পনাকারীদের গুরুত্ব এবং দেশীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতি হিসেবে এখন 'বাঙালি জাতি' বিশ্ব সভায় অনেক অনেক বেশি সমাদৃত হচ্ছে। নিম্নে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কয়েকটি তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরা হলো।

খাত	সন ১৯৭৩-৭৪	২০১৪-১৫*
পণ্য রপ্তানি আয়	৩৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩১২০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
অনুদান	২১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৫৭০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ঋণ	২৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	২৪৭২.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
টাকা-ডলার গড় বিনিময় হার	৭.৯৬	৭৯.৬৮ (এপ্রিল, ২০১৭)

* বা. অর্থ. সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৬ ও ২০১৭

১৯৮০-৮১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল সর্বমোট ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ সালে উৎপাদন হয়েছে ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে GDP তে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান ১১.৭ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩০.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভরতা ২৩ ভাগ হলেও পরবর্তীতে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অভ্যন্তরীণ সম্পদের আহরণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহরে দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৮২.৯ ও ৮১.৪ শতাংশ হলেও ২০১০-১১ অর্থবছরে তা যথাক্রমে ৩৫.২ এবং ২১.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে (২০১৫) চরম দারিদ্র্য হার ১২.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে ৮.৯ শতাংশে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

(ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করুন।
(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব-উত্তর অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসন-শোষনের দীর্ঘ প্রায় সোয়া দু'শত বছর অতিক্রান্তের পর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মুসলিম যুগের অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক) ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ খ) ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ গ) ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ ঘ) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ

২। কখন ইংরেজরা এ ভূখন্ডে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়?
ক) ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ খ) ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ গ) ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ ঘ) ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ

৩। বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোনটি?
ক) পাল যুগ খ) মুসলিম যুগ গ) ইংরেজ যুগ ঘ) মুঘল যুগ

৪। সোনারগাঁয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয় কত সালে?
ক) ১২০০ খ) ১৩০১ গ) ১৫৮২ ঘ) ১৭৫৭

৫। ৭৬ এর মন্বন্তর শুরু হয় ইংরেজি কোন সালে?
ক) ১৭২৮ খ) ১৭৬৮ গ) ১৭৬৯ ঘ) ১৭৭০

৬। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
ক) উত্তর খ) দক্ষিণ গ) পূর্ব ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব

৭। এ ভূখন্ডে ইংরেজরা কত খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার সুযোগ পায়?
ক) ১৬১৫ খ) ১৬৩২ গ) ১৬৩৮ ঘ) ১৬৫১

৮। কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন?
ক) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ খ) শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঘ) ঈশা খাঁ

৯। বাংলা কোন সনে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত?

ক) ১০৭৬ খ) ১১৭৬ গ) ১২৭৬ ঘ) ১৩৭৬

১০। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হলোÑ

i. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন

ii. সাবেক পাকিস্তানি শাসন আমলের বৈষম্যমূলক নীতি

iii. প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

১১। ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন এ স্থানে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলÑ

i. কুটির শিল্প

ii. তাঁত শিল্প

iii. বয়ন শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পলাশ এর দেশে এক সময়ে রণতরীসহ পালতোলা যাত্রীবাহী বিভিন্ন ধরনের নৌকা তৈরি হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়। সমগ্র রাজত্ব কতগুলো পরগণায় বিভক্ত ছিল, জমির উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ কৃষকরা খাজনা দিত।

১২। পলাশ এর দেশে ভারতবর্ষের কোন যুগের অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে?

ক) মুসলিম খ) ব্রিটিশ গ) আদি ও হিন্দু ঘ) পাকিস্তান

১৩। সে যুগেÑ

i. সমাজ ব্যবস্থায় নানান স্তরে ছিল সামন্ত প্রভুর দল

ii. দ্বৈত শাসনের ফলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়

iii. এখানকার নবাব দিল্লির বাদশাকে নগদ অর্থে সেলামি দিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শান্তর দেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদার ব্যবস্থা ছিল। প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা, রাজস্ব আদায়কারীরা জমিদার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করে রাষ্ট্রকে আদায়কৃত রাজস্বের ১০ ভাগ সেলামি দিত। এ ব্যবস্থা চলতে থাকে বংশানুক্রমে।

১৪। শান্তর দেশের সাথে প্রাসঙ্গিক হলোÑ

i. শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহ

ii. মুঘল বাদশাহ’র আমল

iii. দিল্লির বাদশাহী শাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। শান্তর দেশে বিদ্যমান ব্যবস্থা যখন ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, তখন নিম্নের কোনটি সঠিক?

ক) কার্পাসনির্ভর বস্ত্রে ছিল সমৃদ্ধ খ) কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা দিত

গ) এখানকার নবাব দিল্লির বাদশাহকে নগদ অর্থে সেলামি দিত ঘ) দুর্ভিক্ষের কারণে প্রতি ১৬ জনে ৬ জন মারা যায়

পাঠ ১.২ বাংলাদেশে ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ
Geographical Location and Natural Environment in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের আয়তন ও সীমানা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

১. ভৌগোলিক পরিচয় (Geographical Identity) : বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা'র মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। মোট আয়তন হলো ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল বা ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় দেশটি ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের তিনদিকে রয়েছে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মায়ানমার (বার্মা), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, উত্তরে কুচবিহার, মেঘালয় ও আসাম এবং পূর্বদিকে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসাম। তাই বলা যায় ভারতের বৃহত্তর সীমানা বেষ্টিত হলো বাংলাদেশ।

২. সীমানা রেখা (Boundary Line) : বাংলাদেশের মোট সীমানা হলো ৫১৩৮ কিলোমিটার।* এর মধ্যে স্থলসীমা ৪৪২৭ কিলোমিটার এবং সমুদ্রসীমা ৭১১ কিলোমিটার। ভারতের সাথে মোট স্থল সীমানা দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার। মায়ানমারের সাথে সীমানা দৈর্ঘ্য হলো ২৭১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা হলো ১২ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল।*১ এ ছাড়াও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশের সব প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের সার্বভৌমত্বের অধিকার বাংলাদেশের। সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি. মি. অঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. জনসংখ্যা (Population) : ২০০১ সালের শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৩ কোটি যা ২০১১ সালে ১৫.১৭ কোটিতে উন্নীত হয়। ২০১৫-১৬ (সাময়িক প্রাক্কলন) অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৫.৯৯ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৬৩ জন।*২ স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) ১৮.৯ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৫.২ (প্রতি হাজারে); শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে-এক বছরের কম) ৩০ জন।*৩ জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর নবম। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান এবং জাপানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

৪. প্রতিবেশী দেশ (Neighbouring Country) : বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ হলো ভারত, মায়ানমার (বার্মা), নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলংকা।

৫. ধর্ম (Religions) : বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৯.৫% মুসলমান, ৯.৬% হিন্দু, বাকি ০.৯% বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।*

---

* সূত্র : বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

*১. ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কিলোমিটার

*২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

*৩ প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল পুরুষ ৬৯.১, মহিলা ৭১.৬ এবং উভয়ে ৭০.৭

* Bangladesh Demographic Profile-2013

৬. ভাষা (Language) : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র বাংলা। তবে সীমিতভাবে স্কুল-কলেজ এবং উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের প্রচলনও রয়েছে। এছাড়া আংশিকভাবে অফিস-আদালতেও ইংরেজির প্রচলন লক্ষ করা যায়।

৭. উপজীবিকা (Occupation) : কৃষিকার্য বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০ ভাগ কৃষিক্ষেত্রে, বাকি ১৭.৬৪ ভাগ শিল্পে এবং সেবা খাতে ৩৫.০৬ ভাগ নিয়োজিত।

৮. প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative Division) : বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ আছে। বিভাগসমূহ হলোÑঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ। এ বিভাগসমূহের মধ্যে ৬৪টি জেলা, ৪৯০টি উপজেলা ও ৬০৫টি থানা, ৪,৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৫৯,৯৯০টি মৌজা, ৯০,২২৯টি গ্রাম, ১৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৮টি পৌরসভা রয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের পরিবেশের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশটির উপর দিয়ে অসংখ্য নদনদী বয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের ভূমিরূপ উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হওয়ায় এসব নদ-নদী, উপনদী, শাখা নদীগুলো উত্তর দিক হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এসব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। এছাড়া দক্ষিণে প্রবাহিত নদ-নদীসমূহের বয়ে নিয়ে যাওয়া পলি দ্বারা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানায় নতুন নতুন চর জেগে ওঠার ফলে ক্রমাগত দেশের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

পরিবেশ

সাধারণ অর্থে পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় যা মানুষ, প্রাণি ও উদ্ভিদের বিকাশকে প্রভাবিত করে। তবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত করে তাই পরিবেশ। পরিবেশ শব্দটির অর্থ বিস্তৃত ও ব্যাপক। পরিবেশ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বা সামাজিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

পরিবেশের উপাদানসমূহ
Elements of Environment

পরিবেশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও

২. সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment) : আমাদের চারিপার্শ্বে প্রকৃতি প্রদত্ত যে সকল বস্তু আছে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস, অবস্থানের জন্য মাটি, পানি, আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, স্রোত, জীবিত এবং ভৌত উপাদান (অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিভিন্ন ধরনের কার্বনেট ও ফসফেটের যৌগসমূহ প্রভৃতি) যা আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

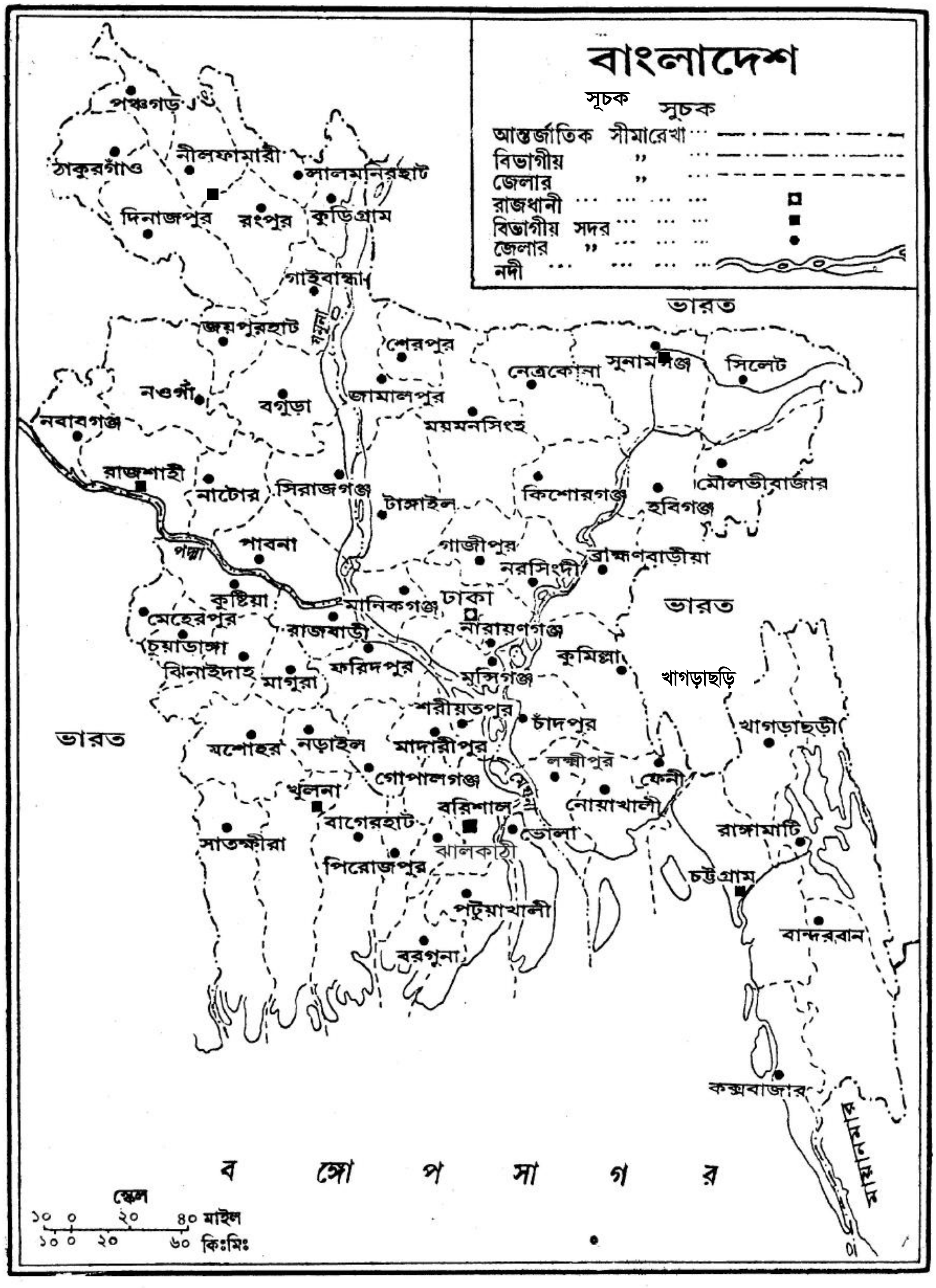

চিত্র : বাংলাদেশ মানচিত্র

প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিষয়ে আমরা অবহিত হই

ক. পরিবেশ দূষণ, জনস্ফীতি, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি ক্রমবর্ধিষ্ণু সমস্যা এবং সেসবের যথাযথ সমাধানে সচেষ্ট হতে পারি।

খ. অরণ্য ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা অনুভব করি।

গ. বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ধারণা পাই।

ঘ. কৃষি, মৎস্য চাষ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া যায়।

ঙ. ফসল অথবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জীবগুলো দমন, জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, বিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ এর উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশ-এর প্রাকৃতিক পরিবেশ

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখনও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের জিডিপি-তে অবদান টেকসই ও উন্নত পরিবেশ (quality of environment) দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ায়, পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মিশে আছে দরিদ্র্য, জনস্ফীতি এবং জন সচেতনতার অভাব। একই সাথে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দুর্যোগÑবন্যা, খরা, মঙ্গা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান : বাংলাদেশ ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা সীমান্ত মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত। এছাড়া তিনদিকে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারতের সাথে সীমানা দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার, মায়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার।

(খ) ভূ-প্রকৃতি : বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ সর্বত্র একরূপ নয়। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দু'ধরনের (যথা-সমভূমি এবং পাহাড়ি) হলেও এর মধ্যে ভিন্নতা বা বিভিন্নতা রয়েছে। কোনো স্থানের ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য, সমভূমি, বনভূমি, বরেন্দ্রভূমি এবং কোথাও মাটির রং লাল বা জলাশয়, হাওর-বিল প্রভৃতি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল; রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হলো প্লাইস্টোসিন-কালের চত্বর ভূমি বা সোপান যা প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বে গঠিত। এছাড়াও রয়েছে খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার বনভূমি। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং চাও উৎপাদন হয়। এছাড়া এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা ও চুনাপাথর। বরেন্দ্রভূমি, গড় ও লালমাই এলাকায় উৎপাদন হয় আলু, আনারস, তরমুজ, ভুট্টা ও পান এবং বিস্তীর্ণ উর্বর সমভূমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তামাকসহ বিভিন্ন সবজি ও ফলমূল।

(গ) উপকূল রেখা : বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে ৭১১ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল রেখা রয়েছে। খুলনার রায়মঙ্গল নদীর মোহনা হতে কক্সবাজারের টেকনাফ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগ ভগ্ন বা অভগ্ন উভয়ই হতে পারে। ভগ্ন উপকূল বিশিষ্ট দেশে সহজেই বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের উপকূল রেখা বেশি ভগ্ন ও গভীর নয়। একারণে চট্টগ্রাম ও চালনা নামক মাত্র দুটি সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠেছে। এছাড়া এ অঞ্চলে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া প্রভৃতি ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে।

(ঘ) নদ-নদী : মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নদীর প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পানীয় জলের অভাবপূরণ, কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ, জলপথে সুলভ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা, মৎস্য আহরণ, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে নদী মানুষের

জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা হলো বাংলাদেশের প্রধান নদী। এছাড়া শাখানদী, উপনদীসহ ২০০ এর অধিক নদ-নদীর পলি বিধৌত উর্বর ভূমির দেশ বাংলাদেশ।

(ঙ) জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত : জলবায়ুর তারতম্যের ফলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের বাসস্থান, পেশা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষের দৈহিক গঠন ও কাঠামো, কর্ম দক্ষতা ইত্যাদিও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ১২০-৩৪৫.৪ সে.মি, বাতাসের গড় আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৯% এবং সর্বনিম্ন ৩৬%।

(চ) তাপমাত্রা : বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। গ্রীষ্মকালে এখানে গড় তাপমাত্রা ২১°–৩৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে ১১°-২৯° সেলসিয়াস থাকে। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৭° সেলসিয়াস এবং শীতকালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৭° সেলসিয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে।

(ছ) মৃত্তিকা : মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূমির বেশিরভাগ নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার মাটিতে প্রাকৃতিকভাবেই নাইট্রিক ও ফসফরিক এসিড থাকায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত এ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি এবং কৃষি নির্ভরশীল শিল্প বিকশিত হচ্ছে।

(জ) উদ্ভিদ : জলবায়ু, মৃত্তিকার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মে। এভাবে বনভূমির সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ ও বনাঞ্চল দ্বারা বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, ভূমি ক্ষয়রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল হলো*1 :

(i) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি বনভূমি যা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য নামে পরিচিত, মোট আয়তন ১৫৩২৬ বর্গ কিলোমিটার।

(ii) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও রংপুরে ক্রান্তীয় পতনশীল ও পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি, মোট আয়তন ৮৭৫ বর্গ কিলোমিটার। এবং

(iii) সুন্দরবন, Tidal বা Mangrove বনভূমি, আয়তন ৬৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার।

যেকোনো দেশের শতকরা ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক হলেও বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র ১১.০০ শতাংশ বনভূমি রয়েছে।*

বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি ও প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত।

(ঝ) খনিজ সম্পদ : মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি যা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিল্প-সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল, কঠিন শীলা, চুনাপাথর, সিলিকা বালু, গন্ধকসহ আরো অনেক মূল্যবান খনিজ-সম্পদ রয়েছে।

(ঞ) প্রাণিজ সম্পদ : প্রাণিজগতও নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। মাছ, মাংস, ডিম, চামড়া, রেশম প্রভৃতি প্রাণিজগৎ হতে পাওয়া যায়। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবহন ও কৃষিকার্য, চামড়া শিল্প প্রভৃতি প্রাণিজগতের উপর নির্ভরশীল।

---

*1 উৎস : K. B. Sajjadur Rasheed (2008); Bangladesh, AHD Publishing house, Dhaka.

* সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বনভূমি রয়েছে ভুটানের (৭১.৮০%), এরপর পর্যায়ক্রমে শ্রীলংকা (৩৩.২০%), নেপাল (২৫.৪০%) ভারত (২৩.৭০%)। সবচেয়ে কম বনভূমি হলো আফগানিস্তান (২.০১%), পাকিস্তান (২.০০)। বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৬

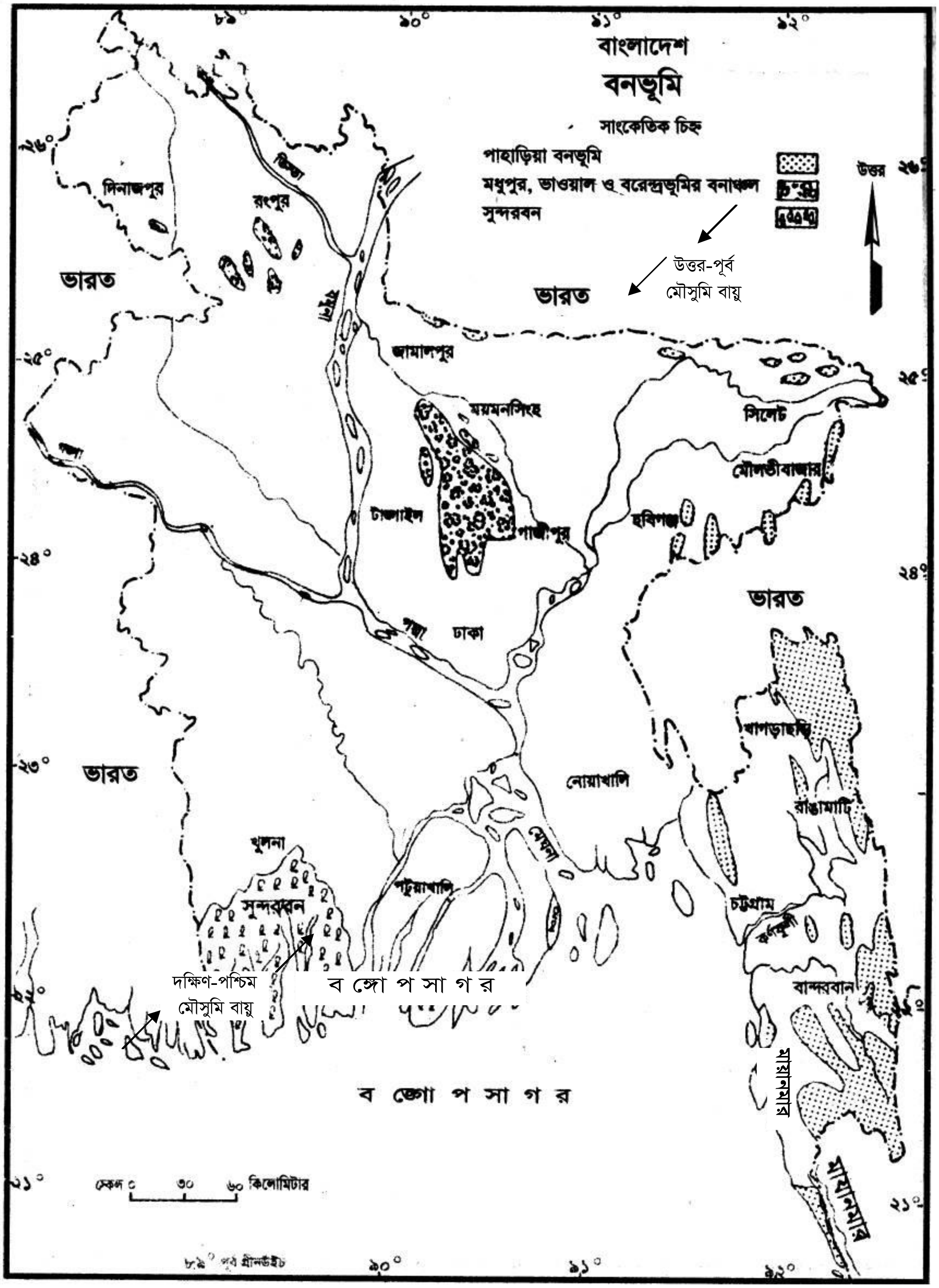

চিত্র : বাংলাদেশের বনভূমি

(ট) বায়ু প্রবাহ : বায়ু প্রবাহ প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। যেমন গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব-মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিহীন শুষ্ক পরিবেশ বিদ্যমান থাকে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর উত্তরের হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর এর যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রান্তীয় গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে (tropical climate) অবস্থিত হওয়ায় সবুজ-শ্যামল রূপ-প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত এদেশ।

২ সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)

মানুষের সামাজিক কার্যাবলির সমষ্টিগত ফলাফল যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, তাই হলো সামাজিক পরিবেশ। এ পরিবেশের উপাদানগুলো হলো জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষাও প্রযুক্তি প্রভৃতি।

জাতি : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। পরিবেশের উপর এদের মানসিকতা, চরিত্র, শারীরিক শক্তি প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম : ধর্ম সামাজিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যেমন সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা।

জনসংখ্যা : ১৯০১ সালে বাংলাদেশ এলাকায় জনসংখ্যা ছিলো ২.৮৯ কোটি*, ১৯৫১ সালে ৪.৪১ কোটি, ২০০১ সালে ১৩.০ কোটি। ২০১৫-১৬ (সাময়িক প্রাক্কলন) ১৫.৯৯ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১০৬৩** জন। কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষি, শিল্প, খনিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনে জনবসতি বিশেষ সহায়তা করে। যেমন : বিরল জনবসতির জন্য অস্ট্রেলিয়া পশুচারণভূমি কিন্তু ঘন জনবসতির ফলে যুক্তরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নত।

এছাড়া সরকারের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, দক্ষ মানব সম্পদ, কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা এসব উপাদান সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন (MDG_s) (লক্ষ্য-৭) এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Physical Environment and Social Environment)

উৎপত্তি বা জন্মগতভাবেই সকল প্রাণিকূল পরিবেশের নিকট দায়বদ্ধ। প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষা, বংশ বিস্তার, উন্নয়ন সবই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশ দু প্রকার। যথাÑ

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং

(খ) সামাজিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ এ উভয় ধারণার মধ্যে যে সকল পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ :

---

* Census of India (1931), বাংলাপিডিয়া-১, বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৬

** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

১. সংজ্ঞা : প্রকৃতি প্রদত্ত যে সকল উপাদান বা শক্তির সমন্বয়ে প্রাণিকুলের উন্নয়নের ধারা প্রভাবিত হয় তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। পক্ষান্তরে মানব সৃষ্ট পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

২. উপাদান : প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলো ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, উপকূলরেখা, নদনদী, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি। অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তি ইত্যাদি।

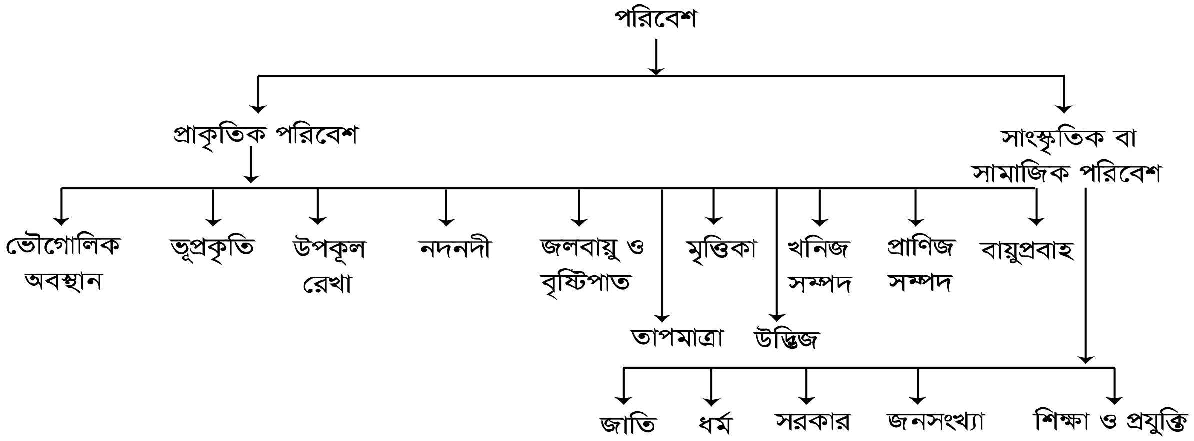

৩. পরিবর্তনশীলতা : প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর উপাদানসমূহ স্থির বা অপরিবর্তনীয় কিন্তু সামাজিক পরিবেশ-এর উপাদানসমূহ পরিবর্তনশীল।

৪. নির্ভরশীলতা : প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ-এর উপর নির্ভরশীল নয় কিন্তু সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর উপাদান দ্বারা প্রভাবিত বা নির্ভরশীল।

৫. অর্থনৈতিক প্রভাব : প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপই নয়, মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, কর্মদক্ষতা ও জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিরও পরিবর্তন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ, প্রগতিশীল এবং পরিশ্রমী। আবার অন্য অঞ্চলের মানুষ অলস প্রকৃতির। তবে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা এরূপ নয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, উন্নয়নমনস্ক প্রগতিশীল জাতি, জনসংখ্যা সভ্যতার বিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে উৎপত্তির ভিত্তি বললে সামাজিক পরিবেশকে সভ্যতার ক্রমবিবর্তন বলা যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালি একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি পরিবেশের সমন্বিত ফল। পরিবেশের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ যন্ত্রশিল্পে উন্নত, বাংলাদেশ ভারতের প্রধান উপজীবিকা কৃষি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিয়ার পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা। অর্থাৎ পরিবেশের তারতম্য অনুসারে শুধু মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপই নয়, মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, জীবনযাত্রার মান, কর্মদক্ষতা ইত্যাদিও পরিবর্তন হয়ে থাকে। পরিবেশের পার্থক্যের কারণে কোনো অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ, প্রগতিশীল আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ অলস প্রকৃতির ও অনুন্নত।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ু দেশটির অর্থনীতির উপর কীরূপ প্রভাব ফেলেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. ভৌগোলিক অবস্থান : যে কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি কোনো দেশের সাথে অন্যান্য দেশের পরিবহন ব্যবস্থার কোনো সংযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে ঐ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। মহাসাগরে প্রবেশের উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার

'বঙ্গোপসাগর', দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, সমুদ্রবন্দর, ভারত ও মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত স্থলপথ, স্থলবন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দ্রুতগতির আন্তর্জাতিক সুপার অপটিক্যাল ফাইবার লাইনের সাথে সংযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। চীন ও ভারতের মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তির পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

২. ভূ-প্রকৃতি : ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবও অপরিসীম। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ ব্যয়বহুল ও কষ্টকর, নদীগুলো খরস্রোতা বলে নাব্য নয়। সেকারণে পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি। অন্যদিকে সমভূমিতে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা সহজ, নদীগুলো খরস্রোতা নয় বলে নৌ-চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী বিধায় বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমভূমি কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে সড়ক পথ, রেলপথ, নৌপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. জলবায়ু : জলবায়ু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলবায়ুর পার্থক্যের দরুন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। এ কারণে দেশের কোনো অঞ্চল বা কোনো দেশ সব প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশ নিজ নিজ ঘাটতি পূরণের জন্য বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।

৪. নদ-নদী : ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদ-নদীর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীপথে স্বল্প খরচে পণ্য-দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়ে থাকে।*

৫. উপকূল রেখা : দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর উপকূল রেখার প্রভাবও লক্ষণীয়। এ রেখা ভগ্ন হলে এবং নিকটবর্তী সমুদ্র গভীর হলে সেখানে বন্দর নির্মাণ করা সহজসাধ্য হয়।

দেশের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে।**

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ : ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাবও অপরিসীম। বাংলাদেশের মৃত্তিকা, খনিজ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ হলো প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ।

অর্থনীতিতে এদের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(i) মৃত্তিকা : মাটির গুণাবলির পার্থক্যের কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার ফসল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের মাটিতে উন্নতমানের পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলে বৈদেশিক বাণিজ্যে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বাঁশ, বেত ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফলে এখানে তাঁত, কুটির ও মৃৎ শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

(ii) খনিজ : পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল খনিজ সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোÑপ্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, চুনা পাথর, ক্লে/শেল এবং খনিজ তেল।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে* খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার হলো বিদ্যুৎ ৪০.৪০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার ১৭.১২%, ইন্ডাস্ট্রিজ ১৬.৭৯%, গৃহস্থালী ১৩.০৩%, সার কারখানা ৬.১৬%, সিএনজি ৫.৩৭%, বাণিজ্যিক ১.০৪% এবং চা বাগান ০.০৯%।

---

* বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৩

** বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৫

(iii) বনজ সম্পদ : বনজ সম্পদও কোনো কোনো দেশের বাণিজ্যিক উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। কানাডা, সুইডেন, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় কাঠের ব্যবসায়ে তারা বেশ উন্নত। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৫-১৬ (সাময়িক) অর্থবছরে বনজ সম্পদ হতে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন হলো যথাক্রমে ১৮,৩৯৮ এবং ২২,৮২৮ কোটি টাকা।

(iv) মৎস্য : নরওয়ে, কানাডা ও নিউফাউন্ডল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি মৎস্য ব্যবসায়ের উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৯ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২২.৬০ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৮৯৮.২২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরিউক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও সামাজিক পরিবেশের উপাদান যেমন জাতি, ধর্ম, শিক্ষা এছাড়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সাহায্য সহযোগিতা প্রভৃতি যে কোনো দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ

(ক) বাংলাদেশের আয়তন ও সীমানা বর্ণনা করুন।
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
(গ) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষ, প্রাণি ও উদ্ভিদের বিকাশকে প্রভাবিত করে উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখে তাকে পরিবেশ বলে।
- আমাদের চারিপার্শ্বে প্রকৃতি প্রদত্ত যে সকল বস্তু আছে তাদের সমষ্টিগত রূপকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?
ক) ২০°৩৪ উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ
খ) ২০°৩৪ উত্তর থেকে ৮৮°০১ উত্তর অক্ষাংশ
গ) ২৬°৩৮ উত্তর থেকে ৯২°৪১ উত্তর অক্ষাংশ
ঘ) ৮৮°০১ উত্তর থেকে ৯২°৪১ উত্তর অক্ষাংশ

২। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?
ক) ২০ক্র৩৪ থেকে ২৬ক্র৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
খ) ২০ক্র৩৪ থেকে ৮৮ক্র০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
গ) ২৬ক্র৩৪ থেকে ৮৮ক্র০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
ঘ) ৮৮ক্র০১ থেকে ৯২ক্র৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

৩। বাংলাদেশের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
ক) বিষুব
খ) কর্কটক্রান্তি
গ) মকরক্রান্তি
ঘ) মেরু বৃত্তীয়

৪। শীতকালে বাংলাদেশকে সাইবেরিয়ান হিমবাহ থেকে রক্ষা করে কোনটি?
ক) বঙ্গোপসাগর
খ) হিমালয় পর্বতমালা
গ) উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়
ঘ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়

* বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৫

৫। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?
ক) ১৫০ নটিক্যাল মাইল খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল
গ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল ঘ) ৩০০ নটিক্যাল মাইল

৬। বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল?
ক) ১০০ খ) ২০০ গ) ২৮০ ঘ) ৩৫৪

৭। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল?
ক) ৯ খ) ১০ গ) ১২ ঘ) ১৫

৮। বাংলাদেশের মোট সীমানা কত কিলোমিটার?
ক) ৫১৩৮ খ) ৪৪২৭ গ) ৪১৫৬ ঘ) ৩৯৯৫

৯। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা কত কিলোমিটার?
ক) ৫১৩৮ খ) ৪১৫৬ গ) ৩৯৯৫ ঘ) ৩৭১৫

১০। মায়ানমারের সাথে সীমানা দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
ক) ৫৮০ খ) ৪৮০ গ) ৩৮০ ঘ) ২২১

১১। টাইডাল বনভূমি রয়েছেÑ
i. খুলনা
ii. পটুয়াখালি
iii. সিলেট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য করণীয়Ñ
i. দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কমিয়ে আনা
ii. দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা
iii. অধিক গাছ লাগানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ হলোÑ
i. প্রাকৃতিক গ্যাস
ii. কয়লা
iii. তামা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলোÑ
i. ভূ-প্রকৃতি
ii. জলবায়ু
iii. জনসংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব হলোÑ
i. ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান
ii. নদীপথে পরিবহন ব্যয় স্বল্প
iii. ব্যবসাবান্ধব ভৌগোলিক অবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুপ্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা দেশ হিসেবে পরিচিতি ছিল। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে দেশটি বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিদেশি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে শাসন ও শোষণ করেছে। পরে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

১৬। উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিম্নের কোনটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক) জলবায়ু চরমভাবাপন্ন　　খ) অপর্যাপ্ত নদ-নদী

গ) উর্বর সমতলভূমি　　ঘ) খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ

১৭। উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শোষণ করেছিলÑ

i. মোঘল

ii. ব্রিটিশ

iii. পাকিস্তান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii　　গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পৃথিবীর মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ দেখালেন। দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং দেশটির মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

১৮। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির নাম কী?

ক) ভুটান　　খ) নেপাল

গ) মায়ানমার　　ঘ) বাংলাদেশ

১৯। দেশটির উত্তরে ভারতের কোন কোন রাজ্য অবস্থিত?

i. পশ্চিমবঙ্গ

ii. আসাম

iii. মেঘালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii　　গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১.৩ বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা
Structure, Features and Trends of Bangladesh Economy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত চিত্র তুলে ধরতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) : যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমষ্টিগত অবদানই দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। এসব ভিত্তিকে অর্থনীতিতে 'অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাত' (Economic Structure or Sector) বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাতকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সংক্ষেপে চার্টের মাধ্যমে অর্থনীতির কাঠামো দেখানো হলো :

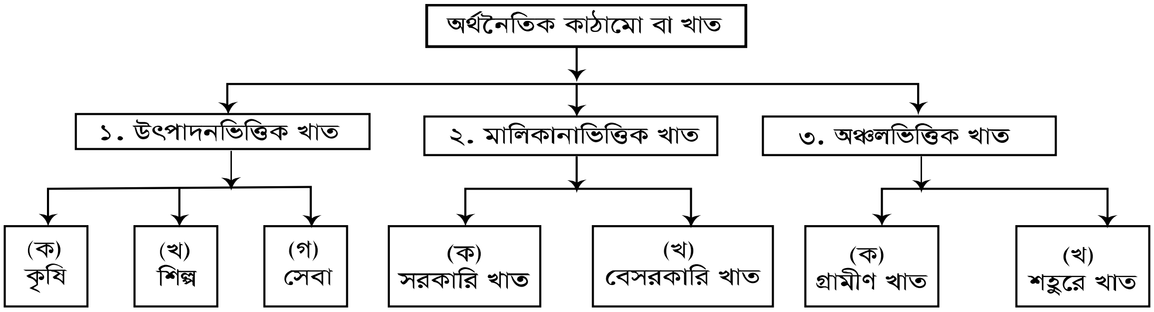

চিত্র : অর্থনৈতিক খাত

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো বা প্রধান খাতসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

১. উৎপাদনভিত্তিক খাত (Production based Sector) : উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) কৃষি, (খ) শিল্প ও (গ) সেবা।

(ক) কৃষিখাত (Agriculture Sector) : বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেশে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ; কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান; কৃষি বিমার প্রচলন; কৃষি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, ই-কৃষি এবং গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ খাতের অন্যান্য উপখাত হলো—ফসল, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং বনজ সম্পদ। গত কয়েক বছর ধরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান :

খাত/উপখাত	২০০৫/০৬	২০০৭/০৮	২০১১/১২	২০১৩/১৪
শস্য ও শাকসবজি	৬.১৭ (১১.১০)	৩.৯৯ (১০.৮৮)	১.৭৫ (১০.০১)	৩.৭৮ (৯.২৮)
প্রাণি সম্পদ	২.১৫ (২.৩৮)	২.২০ (২.১৯)	২.৬৮ (১.৯০)	২.৮৩ (১.৭৮)
বনজ সম্পদ	৫.৪৬ (১.৮৬)	৫.২৬ (১.৮২)	৫.৯৬ (১.৭৮)	৫.০১ (১.৭৪)
মৎস্য সম্পদ	৫.৭৫ (৩.৬৭)	৭.০০ (৩.৭৯)	৫.৩২ (৩.৬৮)	৬.৩৬ (৩.৬৯)

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (অবদান)

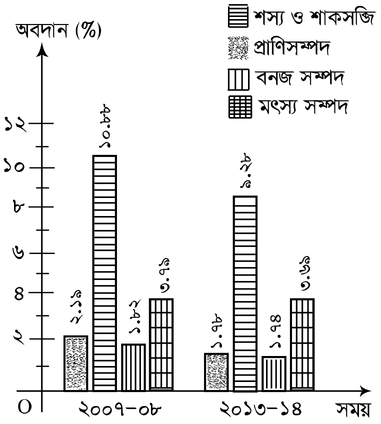

চিত্র : দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের খাতওয়ারি অবদান

(খ) শিল্প খাত (Industry Sector) : উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। এজন্য শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী স্থির মূল্যে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৯ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ সালে ২৯.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩০.৪২ শতাংশ।

জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণÑএ চারটি খাত-এর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ এর শিল্পনীতিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পনীতি ২০১০-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ, শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি, কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ। শিল্পনীতি ২০১০-এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বেগবান করার জন্য বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। রূপকল্প (ভিশন) ২০২১ অনুযায়ী যে শিল্পখাত গড়ে তোলার নীতি (শিল্পনীতি) প্রণীত হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে মোট জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩৫ শতাংশে এবং মোট কর্মরত শ্রমশক্তির হার ১৮ শতাংশ হতে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণÑএ খাতগুলোর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। নিম্নের সারণিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখান হয়েছে :

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০১১-১২	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৯০৭.১ (১০.৭০)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩০৬৭৫.৫ (১০.২৪)
মোট	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৮২.৬ (১০.৩২)

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (শতকরা প্রবৃদ্ধির হার)। ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত।

(গ) সেবা খাত (Service Sector) : অর্থনৈতিক কর্ম যা অবস্তুগত ও অদৃশ্যমান এবং যা মানুষের অভাব পূরণ করে এবং যার জন্য বিনিময় মূল্য দিতে হয়, তাকে সেবা বলে।

বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাংক-বিমা, গৃহায়ণ, লোক প্রশাসন, ডাক্তার-উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকতা, সেবিকার সেবা, শিল্পী ও গায়ক সবই সেবার আওতাভুক্ত এবং প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'তে সার্বিক সেবাখাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫৩.৬২ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৫৩.৯৫ শতাংশ। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের জিডিপি'তে অবদান সর্বোচ্চ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪.১২ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.১০ শতাংশ। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১১.৪৪%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৯.৫৩%); রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৮৩%); লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৪২%); আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৪১%); শিক্ষা (২.২৮%); স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৮৪%) এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁ (০.৭৫%)।

[সূত্র : বা. অর্থ. সমীক্ষাÑ২০১৫]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP তে) কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান উল্লেখ করা হলোÑ

দেশের নাম	মোট দেশজ উৎপাদনে মূল্যসংযোজন (%)		
	কৃষি	শিল্প	সেবা
বাংলাদেশ	১৯	২৯	৫৩
ভারত	১৮	২৭	৫৫
পাকিস্তান	২২	২৪	৫৪
বেলজিয়াম	১	২২	৭৮
যুক্তরাষ্ট্র	১	২১	৭৭

উৎস : World Development Report—2012

সারণি : স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর : ১৯৯৫-৯৬) দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)							
খাত / সময়	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০১১-১২	২০১৪-১৫
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৭.৩৮	১৬.০০
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৮.০৮	৩০.৪২
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৪.৫৪	৫৩.৫৮
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)							
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৩.০১	৩.৩৩
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৪৪	৯.৬৭
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৫৮	৫.৮০
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৬.৭২	৬.৫৪

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ কে বিবেচনা করা হয়েছে।

২. মালিকানাভিত্তিক খাত : সরকারি ও বেসরকারি খাত (Ownership oriented Sector : Public and Private Sector) : মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) সরকারি খাত ও (খ) বেসরকারি খাত।

(ক) সরকারি খাত (Public Sector) : রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন, যাতায়াত ও সেবাখাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে। সরকার **১৯৭২** সালের ঘোষিত জাতীয়করণ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পকে জাতীয়করণ করে। সরকারি খাত হিসেবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত লোকসানের প্রেক্ষাপটে **১৯৮২** সালের ঘোষিত শিল্পনীতিতে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গৃহীত হওয়ায় দেশে বেসরকারি খাত ক্রমশ প্রসার লাভ করতে থাকে।

বর্তমানে সরকারি খাতের আওতায় তথা সরকারি মালিকানায় পরিচালিত নিম্নোক্ত খাতসমূহ বিদ্যমান :

(i) শিল্পখাত (৬টি সংস্থা) : বস্ত্র শিল্প, ইস্পাত শিল্প, চিনি ও খাদ্য শিল্প, রসায়ন শিল্প, বন শিল্প, পাটকল কর্পোরেশন প্রভৃতি।

(ii) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাত (৭টি সংস্থা) : তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ এবং খুলনা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।

(iii) পরিবহন ও যোগাযোগ খাত (৭টি সংস্থা) : শিপিং, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন, সড়ক, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, মংলা বন্দর ডক, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।

(iv) বাণিজ্য খাত (৩টি সংস্থা) : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাণিজ্য (টিসিবি) কর্পোরেশন এবং পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়।।

(v) কৃষিখাত (২টি সংস্থা) : বাংলাদেশ মৎস্য এবং কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

(vi) নির্মাণখাত (৫টি সংস্থা) : রাজধানী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।

(vii) সার্ভিস খাত (১৬টি সংস্থা) : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, রেশম বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চা বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার লক্ষ্যে সরকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক খাত, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক খাত ভিন্ন অন্যসব বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্যোগ নিচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নিট লোকসান ছিল ২৬০৪.৭৩ কোটি টাকা।*

(খ) বেসরকারি খাত (Private Sector) : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সমস্ত খাত বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মুক্ত বাজার ও বেসরকারি খাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৯.৩৮ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২১.৭৮ শতাংশ।

বাজার অর্থনীতির কাঠামো জোরদার ও দক্ষ বেসরকারি খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে—

(i) কৃষি : কৃষির সবগুলো উপখাত (শস্য, মৎস্য, পশু ও বনজ) বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদান, ভর্তুকিসহ নানা প্রকার উৎসাহব্যঞ্জক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের দরিদ্র, হতদরিদ্র কৃষকই প্রশংসার দাবিদার বলা যায়।

(ii) শিল্প : দরিদ্র, জনবহুল এ দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার শিল্প খাতে ব্যবহৃত মৌলিক কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্যের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রাংশের উপর আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাসের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশ সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(iii) সেবা : বাংলাদেশের সেবাখাতের উল্লেখযোগ্য অংশ বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে নৌ ও সড়ক পরিবহনের প্রায় ৯৫%, বেসরকারি বিমান পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, ব্যাংক-বীমা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, টেলি-মিডিয়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. অঞ্চলভিত্তিক খাত : গ্রামীণ ও শহুরে খাত (Regional Sectors : Rural and Urban Sectors) : অঞ্চল ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক খাতকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) গ্রামীণ খাত ও (খ) শহুরে খাত।

নিম্নে এ খাতগুলোর বিবরণ দেয়া হলো :

(ক) গ্রামীণ খাত (Rural Sectors) : (i) কৃষি : বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। কৃষি এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান খাত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ লোক জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ খাতের অন্যান্য উপখাতসমূহ হচ্ছে শস্য ও শাকসব্জি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন, বনায়ন প্রভৃতি। এছাড়াও পাট, গম, চা, আখ, তুলা, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রামীণ খাত।

(ii) শিল্প : গ্রামীণ শিল্পখাত বলতে প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বোঝান হয়। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান মোট শিল্পের অবদানের প্রায় $\frac{১}{৩}$ ভাগ। গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : তাঁত

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫ পৃষ্ঠা ১২০।

শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎ শিল্প, স্বর্ণ শিল্প, কাঠ শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প, বিড়ি শিল্প, লবণ শিল্প, চামড়া শিল্প, সাবান শিল্প, ধাতব শিল্প, নারিকেলের ছোবড়া শিল্প, মিষ্টি শিল্প, তেলের ঘানি, চাল ও ধান ভাঙার কল প্রধান।

(iii) পল্লি বিদ্যুৎ ও গ্যাস : বিদ্যুৎ উৎপাদন শহুরে খাত হলেও পল্লি বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চালু হওয়ায় সেচ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রামীণ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে।

(iv) ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠান : গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। তদুপরি, কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ঋণদান সমিতি, কৃষি উন্নয়নে ঋণদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

(v) ব্যবসায়-বাণিজ্য : গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। সাধারণত গ্রাম্য মহাজন ও বেপারিগণ তথা মধ্যস্বত্বভোগীরা এ ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

(vi) পরিবহন ও যোগাযোগ : গ্রামীণ অর্থনীতিতে নৌ ও সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষাকালে নৌপথের গুরুত্ব অধিক।

(vii) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সরকারের নিবন্ধিত ও নিবন্ধনবিহীন অনেক উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে এ সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, যে সমস্ত খাত দেশের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, সেগুলো গ্রামীণ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) শহুরে খাত (Urban Sectors) : অর্থনীতির যেসব খাত শহর কিংবা শহরতলীতে অবস্থিত সেগুলোকে শহুরে খাত বলে।

নিম্নে প্রধান প্রধান শহুরে খাতগুলো আলোচনা করা হলো :

(i) কৃষি : কৃষি যদিও গ্রামীণ খাতের আওতাভুক্ত, তবুও শহরের আশেপাশে কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্রের আওতাধীন কৃষি খামার, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন কৃষি ফার্ম, গো-খামার, পোলট্রি খামার, নার্সারি প্রভৃতি কৃষি উপখাত শহুরে খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) শিল্প : বিদ্যুৎ, পরিবহনসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে শিল্পখাত মূলত শহরকেন্দ্রিক খাত। শহরে আশেপাশে শিল্প নগরী গড়ে উঠেছে। এখানে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পই সর্বাধিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

(iii) ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান : শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান শহরের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।

(iv) ব্যবসায়-বাণিজ্য : ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান যেহেতু শহরকেন্দ্রিক, তাই ব্যবসায়-বাণিজ্য শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

(v) বিদ্যুৎ ও গ্যাস : বিভিন্ন কল-কারখানায় জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এটি শহরাঞ্চলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আবাসিক সাহায্যকারী উপাদান। এজন্য এ খাতকে শহুরে খাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

(vi) পরিবহন ও যোগাযোগ : পরিবহন ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের প্রধান কার্যালয়সমূহ শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শহরাঞ্চলে অবস্থিত দপ্তরসমূহে নেয়া হয়। তাই এ খাতকে শহুরে খাত হিসেবে ধরা হয়।

(vii) শিক্ষা ও চিকিৎসা : প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত, বিশেষায়িত শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং এর আধুনিকায়নের সুফল সবই শহুরে খাতের এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

(viii) পেশা ও বিবিধ সেবা : সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বিধায় চাকরি ও অন্যান্য সেবাকর্ম শহুরে খাত হিসেবে ধরা হয়। এছাড়াও প্রশাসন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ ও অন্যান্য অনেক সেবাকর্ম বাংলাদেশের শহুরে খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনীতির কাঠামো বা খাতসমূহ যেকোনো দেশের অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল।

অবকাঠামো

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব উপাদান গড়ে তোলা হয় এবং যেগুলোর উপর ভিত্তি করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়, সেসব আর্থ-সামাজিক উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে 'অবকাঠামো' (Infra-structure) বলা হয়।

শক্তিশালী বা মজবুত ভিত্তি ভিন্ন কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য কতিপয় মৌলিক উপাদান বা ভিত্তি প্রয়োজন। অতএব, আমরা বলতে পারি, যে সকল ভিত্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা হয়, তাকে অবকাঠামো বলে। অবকাঠামো বলতে কোনো দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে অবকাঠামোর ধারণা (Concept of Infrastructure in Bangladesh) : বাংলাদেশে অবকাঠামো বলতে পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন ধারা, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ শক্তি, সমাজকল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি, অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতি তথা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। এসব উপাদানকে উন্নত ও দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা হলে উৎপাদনের উপাদানগুলোর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। উন্নয়নের জন্য আবশ্যক এসব ভিত্তি বা বুনিয়াদকে সমষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিতে অবকাঠামো বলে।

প্রকারভেদ : বাংলাদেশের অবকাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারা উপকরণ সংবলিত একটি রূপ।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত উপাদান যেমন—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম। এবং

(গ) অর্থ ও ঋণ সংক্রান্ত উন্নয়ন ধারা।

এক্ষেত্রে প্রথমটিকে **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে** অবকাঠামো, দ্বিতীয় অবস্থাকে **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার** সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো ও তৃতীয় অবস্থাকে **অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক** অবকাঠামো বলে।

সাধারণভাবে, প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে অবকাঠামোকে দু ভাগে ভাগ করা হয় :

(i) সামাজিক অবকাঠামো (Social Infrastructure)

(ii) অর্থনৈতিক অবকাঠামো (Economic Infrastructure).

সামাজিক অবকাঠামো (Social Infrastructure)

সামাজিক অবকাঠামো হলো ঐ সব সামাজিক বিষয়, যা কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে এবং উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সামাজিক অবকাঠামোর দ্বারা দেশের জনগণ অধিক দক্ষ, উদ্যমী ও কর্মঠ জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, বাসস্থান, পরিবার কল্যাণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা প্রভৃতি। এগুলো সমাজের মানুষের উদ্যম, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও আচরণকে প্রভাবিত করে।

অতএব আমরা বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এসব সামাজিক উপাদানগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো (Economic Infrastructure)

অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। যে সব অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল রেখে উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখে, সে সব উপাদানের সমষ্টিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নামে অভিহিত করা হয়। কেননা, এর উপর দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। প্রসারিত অর্থে সুষ্ঠু যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেমন—রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ, আকাশপথ, ডাক, তার, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাঁধ, সেতু, শক্তি সম্পদ, পানি সরবরাহ প্রভৃতিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় ধরা হয়।

বৈশিষ্ট্য : অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে—

(এক) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।

(দুই) পণ্যদ্রব্য এবং সেবার যোগান অব্যাহত ও স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

(তিন) মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

(চার) উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

(পাঁচ) রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার সহায়ক শক্তি হিসেবে সহায়তা করে।

(ছয়) জনগণের মাঝে সুস্থ উপলব্ধির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(সাত) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মজবুত করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর তিন দশক পর নতুন সহস্রাব্দে এসেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেজিভাব অনুপস্থিত। এখনো উন্নয়নের শ্লোগান শোনা যায়, কিন্তু এর প্রভাবে পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। স্বাধীনতার চার দশক পর বর্তমান বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ, উন্নত জনপদ হবে এটিই ছিলো প্রত্যাশিত। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, তবে বর্তমানে প্রচেষ্টা চলছে।

নিম্নে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা উপস্থাপন করা হলো :

১. কৃষির অবদান : কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। ২০১৪-১৫* সালের হিসাব অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিকভাবে কৃষিখাতের (ফসল, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১৬.০১ ভাগ। শস্য ও শাকসব্জি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ উপখাতসমূহের সমন্বয়ে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান জিডিপিতে ১২.৩২ শতাংশ, মৎস্য খাতের অবদান GDP এর ৩.৬৯ শতাংশ। ২০১৬ সালের [Labour Forch Survey-2013] সমীক্ষায় দেখা যায়, এখনো দেশের ৪৫.১% জনশক্তি কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত।

২. কৃষির ক্রমোন্নতি : বর্তমানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের বাতাস বইছে। উৎপাদকগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ও দায়িত্ববান। তাই গুরুত্ব অনুভব করে তারা উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধার বন্দোবস্ত করে অধিক উৎপাদনে মনোনিবেশ করছে।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

৩. শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ : বর্তমানে সরকার শিল্প স্থাপনে অধিক উৎসাহপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকার সুপরামর্শ, বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, শিল্প নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষণের জন্য নানা প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, বিদেশে বাজার সৃষ্টিতে নানা দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করছে। এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান, (%)		
২০০৫-০৬	২০০৯-১০	২০১৩-১৪
২৫.৩৯%	২৬.৭৮%	২৯.৫৫%

আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে যে শিল্পখাত গড়ে উঠবে তাতে আশা করা যায়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) শিল্প খাতের অবদান ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে এবং মোট কর্মরত জনশক্তির হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস : ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭% এবং World Development Report-2014 অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩% এ উপনীত হয়।

২০১৬ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা (প্রক্ষেপিত) ১৫৯.৯ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% উল্লেখ করা হয়।

৫. বেকার সমস্যা : বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যা বিরাজমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম। যার ফলে বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। তাই বেকার সমস্যার তেমন উন্নতি হয়নি। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণ যেহেতু এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে EPZ এবং 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' চালু হচ্ছে, ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা হ্রাস পাবে।*

৬. মাথাপিছু আয় : World Development Report 2014-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় (GNI) ৮৪০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৬০২ মার্কিন ডলার।*১

৭. জীবনযাত্রার মান : জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে। বা. অর্থ. সমীক্ষা—২০১৬ এর হিসাব অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান পূর্বের চেয়ে উন্নত হওয়ায় প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষ ৬৯.৯, মহিলা ৭১.৫ ও উভয় ৭০.৭ বছর হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় (টিউবওয়েলের) পানি গ্রহণকারী ৯৭.৮%। সাক্ষরতার হার ৬২.৩%।

৮. প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি : বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 'বাংলাদেশ' নামটি পৃথিবীতে যথেষ্ট সুনাম ও পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ পূরণ করে। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৯. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি : বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণও উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক উদ্দীপনামূলক, সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারিগণ আকর্ষিত হয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ১৯.৯৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

১০. খাদ্য সমস্যা ও পুষ্টিহীনতা : সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিক জনসংখ্যা কিন্তু সে তুলনায় কৃষি উৎপাদন

* সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দেশে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ। প্রতি বছর ১৩.৪ লক্ষ জন শ্রমবাজারে যোগ দিচ্ছে।
Ñ বাজেট বক্তৃতা : ২০১২-১৩

*১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭

কম হওয়ায় বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি বিদ্যমান। বর্তমানে উন্নত সার, বীজ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দিন দিন শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫Ñ২০০৬ অর্থবছরে খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয় ২৭২.৬৮ লক্ষ মে. টন পক্ষান্তরে ২০১৪-১৫ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৮৪.১৯ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% আসে মাছ থেকে। সরকারের গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) মাধ্যমে ধীরে ধীরে খাদ্য সমস্যা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে।

১২. বৈদেশিক বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্বে প্রচুর ঘাটতি ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বন্ধুদেশে আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। তবে এখনো বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূলে আসেনি।

১৩. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা : বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাস পাচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ছিল ২৩ ভাগ এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ করা হয় ৪৮ ভাগ। পঞ্চম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ধরা হয় ৬১.৪৫%। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এটিকে নিজস্ব উৎসের উপর অধিক নির্ভরতার ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিগত একদশকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। যেমন :

সাল	২০০৬-০৭	২০০৯-১০	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
ADP এর শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৩.১৫	৪২.১১	৭৩.৭৯	৬৪.৬৭	৬৫.২২

১৪. শিক্ষার হার : দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলাকে সরকার 'নিরক্ষরতা মুক্ত' ঘোষণা করেছে। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৩.৬% এ উন্নীত হয় (বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৭)।

১৫. সামাজিক কুসংস্কার : বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে সামাজিক নানা কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। বর্ণবৈষম্য, পর্দা প্রথা, বাল্য ও বহু বিবাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

১৬. কারিগরি জ্ঞানের প্রসার : দেশে বর্তমানে যুবকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করে এর নানামুখী ব্যবহারের প্রতি যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৭. মুদ্রাস্ফীতি :[*1] মুদ্রাস্ফীতির সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৩৫ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৫) সময়ে এ হার ছিল ৬.৪৫ শতাংশ। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির গতি কিছুটা উর্ধ্বমুখী হলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা নিম্নমুখী ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যসহ অন্যান্য পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। মার্চ, ২০১৬ সময়ে এ হার পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ।[*২]

১৮. পরিকল্পনা : সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য দেশপ্রেমিক ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের সাহায্যে সঠিক বাস্তবানুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করছে।

---

* বা. অর্থ. সমীক্ষাÑ২০১৫।

*১. ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা (UK Charity) Oxfam এর গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়-আগামী ২০ বছরে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হবে এবং ২০৫০ সালে খাদ্যের চাহিদা বর্তমান অপেক্ষা ৭০% বৃদ্ধি পাবে। The Daily Star; June 1, 2011.

*২. দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো, পৃ. ১৮, ০৬.০৪.২০১৬

১৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ১৯৯৮, ২০০৪-এর বন্যা এবং ২০০৭ সালে দু'বার উপর্যুপরি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় "সিডর", ২০০৯ সালে দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়সহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের জনগণ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০. দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি : বর্তমানে আমাদের উৎপাদিত অনেক পণ্যদ্রব্য বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করেছে। দেশীয় দক্ষ উদ্যোক্তার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২১. দারিদ্র্য বিমোচন : দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুমাত্রিক জটিল ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চহারে বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। ফলে তাদের মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২২. বেসরকারিকরণ : দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি খাতের তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি খাত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের বর্তমান শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাত উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ কমিশন গঠন করা হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮১টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২৩টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ১৫টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের কাজ চলছে।

২৩. আর্থিক খাত সংস্কার : দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আর্থিক খাতের অধিকতর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন ২০০১/২০০২ অর্থবছরেও অব্যাহত ছিল। বর্তমানে এ সংস্কার কর্মসূচিকে আরও সময়োপযোগী করা হয়েছে। প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আর্থিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—

(i) টাকার বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার চালু করা হয়েছে।

(ii) ঋণ বাজারে উচ্চ 'সুদ হারের জড়তা' (interest rate rigidity) নিরসন করে সুদ হার নিম্নমুখী করার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুদের হার যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

(iii) ব্যাংকিং খাতকে আরও শক্তিশালী করে একে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক স্তরে উন্নীত করা এবং মূলধন সংরক্ষণ আরও ঝুঁকি-সহনশীল ও সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(iv) বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকীকরণ, সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩; অর্থ ঋণ আদালত আইন; সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩; আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU) চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ন্যূনতম মূলধন এর পাশাপাশি আপৎকালীন মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালাও চালু করা হয়েছে।

(v) আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে FIU কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের নগদ লেনদেন প্রতিবেদন এবং সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের অনলাইন রিপোর্টিং ও বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন কার্যকর বিশ্লেষণের লক্ষ্যে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) হতে ক্রয়কৃত 'go AML' Softwareটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(vi) এছাড়াও বিমা আইন, ২০১০; বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এবং পুঁজিবাজারকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার পুনর্গঠনে নানাবিধ পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। যেমন সকল শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করা হয়েছে, পরিচালকদের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে পরিশোধিত মূলধনের ৩০ শতাংশ এবং এককভাবে ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক এবং ঋণ-সীমা পুনঃনির্ধারণ প্রভৃতি।

সরকার সংস্কার কর্মসূচিতে আইনগত সংস্কার, আর্থিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তহবিল ও তারল্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ব্যাংকসমূহের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পুঁজি বাজার উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে আর্থিক খাতে ঋণ ঝুঁকি (Credit risk), বাজার ঝুঁকি (market risk) ও পরিচালনা ঝুঁকি (Operational risk) মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

২৪. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ কারণে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে উন্নয়নের গতি দ্রুত হওয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হতো।

২৫. সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাত : সরকার জনকল্যাণে, দরিদ্রতা লাঘবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে; যেমন :

(i) দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বয়স্ক ভাতা।

(ii) গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল গঠন।

(iii) সামাজিক সুরক্ষার আওতায় গর্ভধারিণী হতদরিদ্র মা'কে প্রতি মাসে ভাতা প্রদান।

(iv) দেশে বেকার যুবকদের 'কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক' স্থাপন এবং ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনসহ নানা আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ।

এছাড়াও, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য দুস্থ মহিলা ভাতা, দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহায়ণ কর্মসূচি, আশ্রয়ন আবাসন প্রকল্প, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পথশিশু, এতিম শিশুদের উন্নয়নে তহবিল বরাদ্দ; ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ, ঘরেফেরা কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগণের মাঝে রেশনিং প্রথা চালু প্রভৃতি সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, গত চার দশকে বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও ফলন অনেক বেড়েছে, জনসংখ্যা অনেক বাড়লেও মাথাপিছু আয়ু, গড় আয়ু, জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। দেশজ উৎপাদনে শিল্প ও সেবাখাতের অবদান কৃষি অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির নয় আবার উন্নতও নয়। গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে **কাঠামোগত পরিবর্তন** (পরিমাণগত ও গুণগত কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক পরিবর্তন) সাধিত হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেন, "বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এ উদাহরণ তুলে ধরতে পেরেছে যে, শুধুমাত্র মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়, বরং শিক্ষা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারও উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত।"*

তিনি আনন্দের সাথে আরও বলেন, "বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে যেকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাই সদস্য হিসেবে পেতে আগ্রহী হবে।"

* স্বাধীনতা-উত্তর অনেকেই বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' (bottomless basket) কিংবা 'উন্নয়নের গিনিপিগ' (test case of development) বলে কটূক্তি করেছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে এক অমিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অভিজাত সংঘের (7 percent club) পরবর্তী সম্ভাবনাময় সদস্য হিসেবে। বাংলাদেশকে গণ্য করা হচ্ছে ১১টি থ্রিজি (Global Growth Generators) দেশের মধ্যে। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় ২৬টি দেশের তালিকায় চীন ও ভারতের সঙ্গে একই কাতারে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল মিশ্র অর্থনীতির দেশ। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয় বৈষম্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেও বার বার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে প্রবৃদ্ধির হার গত এক দশক যাবৎ ৬ শতাংশের ঘরে ওঠানামা করছে। মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রায় মান, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা তুলে ধরা হলো :

১. অর্থের সরবরাহ : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সূচনালগ্নে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর দেশে অর্থের সরবরাহ ছিল ৫৪৬.০২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে অর্থের যোগানের পরিমাণ (ব্যাপক মুদ্রা M_2) দাঁড়ায় ১,৩০২.৪০ কোটি টাকা এবং মার্চ ২০১৬*[১] সালে ৮,৫৩,১৮৫ কোটি টাকা।

২. জনসংখ্যা : জনসংখ্যাও সময়ের সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নের সারণিতে জনসংখ্যার গতিধারা তুলে ধরা হলো :

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৭৪	৭.৬৪
১৯৮১	৮.৯৯
১৯৯১	১১.১৪
২০০১	১৩.১৫
২০১৫-১৬ (প্রাক্কলন)	১৫.৯৯
২০১২ World Dev. Report-2014	১৫.৫০

সূত্র : Bangladesh Population Census : 1981 এবং 1991, বা. অর্থ. সমীক্ষা ২০১৬

৩. শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান : ১৯৯৫/৯৬ সালে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ছিলো যথাক্রমে ৬৩.২, ৭.৫ এবং ১২.০ শতাংশ যা ২০১৩ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৪৫.১ শতাংশ এবং অকৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৫৪.৯ শতাংশ। তথ্য হতে লক্ষ করা যায়, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার হ্রাস পেলেও শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. কৃষি উৎপাদন : কৃষি উৎপাদনের গতিধারা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ কৃষিখাতে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)

বছর	১৯৮০-৮১	১৯৯০-৯১	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
মোট খাদ্যশস্য	১৪৯.৭	১৮৮.৬	৩৭২.৬৬	৩৮৪.১৯

বা. অর্থ. সমীক্ষা-১৯৯৭, ২০১৬

৫. শিল্প উৎপাদন : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যয়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নÑএসব ক্ষেত্রে শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

*[১] সংকীর্ণ মুদ্রা (M_1) ও রিজার্ভ মুদ্রা হলো যথাক্রমে ১,৭১,৪৯৭ ও ১,৬১,৮৮২ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প তথা মোট শিল্পখাত হতে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির হার :

বছর	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০১২-১৩	২০১৩-২০১৪
মোট প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)	৫৪১১.৭ (৭.৩)	৭২৮২.৩ (৫.৩)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)

(বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার)

৬. সঞ্চয়-বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার) : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খাতেও পরিবর্তনের ধারা সচল ছিলো। যেমন :

বছর	১৯৯৬-৯৭	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬ (সাময়িক হিসাব)
দেশজ সঞ্চয়	৭.৭	২২.০৯	২৩.৮৯
জাতীয় সঞ্চয়	১৪.৪	২৯.২৩	৩০.৩১
মোট বিনিয়োগ	১৭.৪	২৮.৫৮	২৯.৩৮
সরকারি বিনিয়োগ	৬.৫	৬.৫৫	৭.৬০
বেসরকারি বিনিয়োগ	১০.৯	২২.০৩	২১.৭৮

বা. অর্থ. সমীক্ষা-১৯৯৭, ২০১৬

গত দেড় দশকে অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি খাত অপেক্ষা বেসরকারি খাতের অবদান ছিলো বেশি।

৭. অর্থনৈতিক খাত : দেশজ উৎপাদনে বাংলাদেশের সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নের সূচিতে তুলে ধরা হলো :

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)				
	১৯৮০-৮১	১৯৯০-৯১	২০০০-০১	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
কৃষি	৩৩.০৭	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৭৮	১৬.৫০
শিল্প	১৭.৩১	২১.০৪	২৬.২০	২৯.০০	২৯.৫৫
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৪.২২	৫৩.৯৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উপরের টেবিল হতে দেখা যাচ্ছে যে, গত চার দশকে বাংলাদেশে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।

৮. প্রকৃত GDP ও প্রবৃদ্ধির হার : বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বাংলাদেশ এর অভ্যুদয় হতে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এর আয়তন, মাথাপিছু GDP, প্রবৃদ্ধির হার সবই ছিল স্বল্প (Small), সন্তোষজনক নয়। অবশ্য এর পিছনে অনেক কারণ দায়ী, যেমন : প্রয়োজনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ খাদ্যের সরবরাহ বা উৎপাদন স্বল্প, রপ্তানি যথেষ্ট স্বল্প কিন্তু আমদানি ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) আকর্ষণে ব্যর্থ, ক্রটিযুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উচ্চ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হার, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমাগত লোকসানের ভারে আক্রান্ত, দুর্বল অবকাঠামো, অদক্ষ কর ব্যবস্থা-কর প্রশাসন, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, শিক্ষার অভাব এবং বেকারত্ব। উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যাসমূহের তীব্রতা হ্রাস বা সমাধান করা সম্ভব। প্রকৃত GDP এবং প্রবৃদ্ধির হারের গতিধারা নিম্নে দেখান হলো :

বছর	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০১৫-১৬ (সাময়িক)
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.৭	৩.৪	৪.৩	৩.৪	৫.৩	৭.০৫

উৎস : অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০, পৃ. ১৮৪-১৮৫

(কোটি টাকায়)

বছর	GDP	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৬-০৭	৫,৪৯,৮০০	৭.০৬
২০১০-১১	৯১,৫৮,২৯	৬.৪৬
২০১১-১২	১০,৫৫,২০৪	৬.৫২
২০১২-১৩	১১,৯৮,৯২৩	৬.০১
২০১৩-১৪	১৩,৪৩,৬৭৪	৬.০৬
২০১৫-১৬*	১৭,২৯,৫৬৭	৭.০৫

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০১৬, (*সাময়িক হিসাব) ভিত্তি বছর : ২০০৫-০৬

সূচি থেকে বোঝা যায়, GDP এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়লেও প্রবৃদ্ধির হার মাঝে মধ্যে স্বল্প ছিল। তবে ২০০০ সালের পরবর্তী বছরগুলোতে এই প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের অধিক ছিল। ২০০৮-১০ সময়ে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৬% এর অধিক ছিল। কিন্তু তখন অনেক উন্নত দেশের অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত হয়েছিল।

৯. বিদ্যুৎ উৎপাদন : ১৯৯৭ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ২৯০৮ মেগাওয়াট, উৎপাদন হতো ১৬০০-১৮০০ মেগাওয়াট। ২০১৫-১৬ (ফেব্রুয়ারি '২০১৬ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৬,৪৪০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,১৮৬ মেগাওয়াট এবং ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা ১২,১২৬ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৮,১৭৭ মেগাওয়াট (১৩ আগস্ট ২০১৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে।

১০. গ্যাস ও জ্বালানি : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। দেশে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিলো ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (২০১৬)। এর মধ্যে উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; ব্যবহারের পর জানুয়ারি ২০১৬ সময়ে নিট মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে তা ১০ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা সোলার, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাসভিত্তিক উৎপাদিত হবে।

১১. মূল্যস্ফীতি : মূল্যস্ফীতির গতিধারা সর্বদাই ছিলো অনিশ্চিত। এটি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ কারণে সৃষ্ট।

নিম্নের সারণিতে এ গতিধারা তুলে ধরা হলো :

বছর	মূল্যস্ফীতি
১৯৯৪-৯৫	৫.২
১৯৯৫-৯৬	৪.১
২০১৩-১৪	৭.৩৫
২০১৫-১৬ (জুলাই-এপ্রিল ২০১৬)	৬.০১

সূত্র : বা. অর্থ. সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৬

মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের মূল্যের পরিবর্তন, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যুদ্ধ পরিস্থিতি, মন্দা আক্রমণ, আরব বসন্ত, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে মূল্যস্ফীতির গতিধারা পরিবর্তিত হয়।

১২. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস : বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিগত এক দশকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদার, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ায় পরনির্ভরশীলতা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। রপ্তানি আয় পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

১৩. দারিদ্র্যের মাত্রা : স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১১ সালে দারিদ্র্যের হার ২৯.৬৯ শতাংশ

থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশকে (২০০১-২০১০) বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। কিন্তু এর ঠিক আগের দশকে (১৯৯০-২০০০) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছিল মাত্র ২৩ লক্ষ।

গত এক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশ, আমদানি ও রপ্তানি খাতে কাঠামোগত পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ, বাজেট প্রণয়নে পরনির্ভরশীলতা হ্রাসসহ নানামুখী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির কয়েকটি সূচকের পরিবর্তনের গতিধারা তুলে ধরা হলো :

সারণি-১

বা. অর্থ. সমীক্ষা	২০১৭	১৯৯৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%),	১.৩৭ (২০১৫)	২.১৭
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল; উভয়	৭০.৯ (২০১৫)	৫৯.৫
পুরুষ	৬৯.৪	৬০.০
মহিলা	৭২.৩	৫৯.০
বা. অর্থ. সমীক্ষা	**২০১৭**	**১৯৯৭**
মাথাপিছু আয়, মার্কিন ডলার	১৬০২	২৫০
সাক্ষরতার হার, %	৬৩.৬ (২০১৫)	৪২.৬
জাতীয় সঞ্চয় GDP এর	৩০.৩০	১৪.৪
মোট বিনিয়োগ GDP এর	৩০.২৭	১৭.৪
রপ্তানি আয় মিলিয়ন মা. ডলার (ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত)	২২,৮৩৬	৪৩৮০
আমদানি ব্যয় মিলিয়ন মা. ডলার (ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত)	৩০,৬৭২	৭১৭০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মিলিয়ন মা. ডলার**	৩২,৪৬৬ (১৯ এপ্রিল, ২০১৭)	১৮২৬
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ মিলিয়ন মা. ডলার	১৪,৯৩১ (মার্চ ২০১৭)	১২০৩
দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা (%), জাতীয়	৩১.৫০	৪৬.৭
দারিদ্র্যের নিম্নসীমা (%), জাতীয়	১৭.৬০	২৬.২
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হিসেবে		
কৃষি	৪৫.১	৬৩.২
শিল্প	অকৃষি ৫৪.৯	৭.৫
সেবা		১২.০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭, ২০১৬ এবং ১৯৯৭

শিক্ষার্থীর কাজ

(ক) বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো বর্ণনা করুন।
(খ) বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।
(গ) বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারার সাম্প্রতিক পরিবর্তন চিহ্নিত করুন।

** মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার স্থিতিশীল বিনিময় হার বজায় থাকায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি সহায়তা (উন্নয়ন) তহবিলের পরিমাণ ও আওতা সম্প্রসারণ করায়, রপ্তানিকারকদেরকে নানা রকম প্রণোদনা দেয়ায় রপ্তানি আর বৃদ্ধি, প্রবাসি আয়ের সন্তোষজনক প্রবাহ অব্যাহত থাকা, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাত কর্তৃক বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে খাদ্য আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং বহির্বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম ও জ্বালানির দাম হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে আমদানি দায় হ্রাস পেয়েছে যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।−বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ এপ্রিল, ২০১৫; পৃষ্ঠা ৭

সারসংক্ষেপ

- যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিগত অবদানের ভিত্তিকে অর্থনীতির কাঠামো বলা হয়। এরূপ কাঠামো দু'প্রকার। যথা– (i) সামাজিক অবকাঠামো–শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি এবং (ii) অর্থনৈতিক অবকাঠামো–রেলপথ, সড়ক পথ, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও শক্তি সম্পদ প্রভৃতি।
- বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব অনেক হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষা, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, গড় আয়ু ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৪০ সালে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হবে–এ আশা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদান?
ক) মূল্যবোধ খ) শিক্ষা গ) স্বাস্থ্য ঘ) হাইটেক পার্ক

২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদান কোনটি?
ক) বাসস্থান খ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গ) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ঘ) যাতায়াত ও যোগাযোগ

৩। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক খাত কোনটি?
ক) কৃষি ও শিল্পখাত খ) বন ও পরিবেশ খাত
গ) সরকারি ও বেসরকারি খাত ঘ) গ্রামীণ ও শহুরে খাত

৪। মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ৫ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ২

৫। বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যÑ
ক) কৃষিখাতে অগ্রসরতা খ) জনশক্তির অপূর্ণ ব্যবহার
গ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঘ) অনুকূল সামাজিক পরিবেশ

৬। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা খ) বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা
গ) কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা

৭। বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারায় নিচের কোনটি হ্রাস পাচ্ছে?
ক) মাথাপিছু আয় খ) দারিদ্র্যের হার
গ) গড় আয়ুষ্কাল ঘ) জীবনযাত্রার মান

৮। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোÑ
i. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
ii. ক্রমবর্ধমান হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
iii. শিল্পে পশ্চাৎপদতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনভিত্তিক খাতÑ
i. কৃষি
ii. শিল্প
iii. সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। বাংলাদেশের অর্থনীতির মালিকানাভিত্তিক খাত হচ্ছেÑ

i. ব্যক্তি খাত ও রাষ্ট্রীয় খাত
ii. একমালিকানা খাত ও যৌথ মালিকানা খাত
iii. সরকারি ও বেসরকারি খাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১। বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছেÑ

i. অনুন্নত কৃষি
ii. স্বল্প মাথাপিছু আয়
iii. উচ্চ মূলধন ও বিনিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বৃদ্ধ আব্দুল জব্বার বললেন এই জীবনে তিন দেশের নাগরিক হলাম কিন্তু ঘর ছেড়ে কোথাও গেলাম না।

১২। আব্দুল জব্বার কোন তিন দেশের নাগরিক ছিলেন?

ক) বাংলাদেশ, ভারত ও বার্মা খ) বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপাল
গ) বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান ঘ) বাংলাদেশ, নেপাল ও বার্মা

১৩। আব্দুল জব্বারের বিভিন্ন দেশে নাগরিক হওয়ার কারণ কী?

ক) কর্মসংস্থান খ) অভিবাসন গ) দেশ বিভক্তি ঘ) নাগরিকত্ব বাতিল

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম শেরপুর জেলার একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষক। তার জমি খুব সামান্য। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি সবজি বিক্রেতা হিসেবে অনেক পরিচিত। কিন্তু এ বছর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সবজি বিক্রি সে বন্ধ রাখে।

১৪। উদ্দীপকে রহিমের কীরূপ দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে?

i. মাথাপিছু স্বল্প আয়
ii. মূলধন স্বল্পতা
iii. দুর্বল অবকাঠামো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। অনুচ্ছেদের সাথে কোন লাইনটি প্রাসঙ্গিক?

ক) বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি খ) শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ
গ) দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ঘ) মূলধনের যোগান সংকট বিদ্যমান

পাঠ ১.৪ বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান
Position of Bangladesh in Global Context

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারবেন;
- বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি *

বিশ্ব অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির** ধারায় ফিরলেও প্রবৃদ্ধির গতি এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ সাল হতে ক্রমাগত হ্রাস পেলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO) April 2017 এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এ প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা, বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের ক্রম উর্ধ্বগতি ইত্যাদি বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করছে। এছাড়া, কতিপয় দেশের অন্তর্মুখী সংরক্ষণ নীতি, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ, চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত–

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। গত ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.০৬ ও ৬.৫৫ শতাংশ। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান গড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান

বৈশ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সর্বদাই অনুকূল বা সন্তোষজনক থাকে না। ২০০৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ উন্নত দেশগুলোতে মন্দা শুরু হয়। উক্ত দেশ ও অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও উক্ত মন্দার অভিঘাত পড়ে। বিশ্বায়নের ফলে এ ধরনের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা সমগ্র বিশ্বকেই আন্দোলিত করে।

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক ও হোসিয়ারি, হিমায়িত খাদ্য চিংড়ি, চামড়াসহ রপ্তানির বৃহত্তম অংশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি হয়। বিশ্বব্যাপী এ অর্থনৈতিক মন্দার (Global Economic Meltdown) সময়ে

* বা. অর্থ. সমীক্ষা ২০১৬, ২০১৭।

** প্রবৃদ্ধি : উৎপাদনের বার্ষিক পরিবর্তনের হার। অর্থনীতির যেকোনো খাতের বার্ষিক চলমান পরিবর্তনের হারকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের কৃষিখাতের শক্তিশালী ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে অর্থনৈতিক জোট গঠন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের সাথে GSP (Generalized System of Preferences) বা কোটা সুবিধা বিদ্যমান থাকায় পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় সম্প্রসারণ, সময়োপযোগী আর্থিক ও রাজস্বনীতি বাস্তবায়নের ফলে রাজস্ব আদায়ের উচ্চ হার, মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা, উচ্চ বাজেট ব্যবস্থাপনা, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কারণে বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও সুইডেনসহ মোট ৬২টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট রয়েছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০০৯ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের উপর। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৩৭ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মোট বিনিয়োগ ২০১৫-১৬ অপেক্ষা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি এর ৩০.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

একসময় কৃষিতে শ্রমশক্তির প্রায় ৮০ ভাগ নিয়োজিত ছিল। দারিদ্র্যের হার অতীতে প্রায় ৫০ ভাগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার হ্রাস পেয়ে শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে শ্রমশক্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্যের হার পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধির ফলে গড় আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৬ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩.২ শতাংশে।* বর্তমানে এ হার আরও অনেক হ্রাস পেয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) পাশাপাশি সম্পূর্ণ বেসরকারিখাতকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশ বিশ্বায়নের অপার সম্ভাবনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত হতে পারে। যেমনÑ

(i) বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে **মানবসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধি** করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

(ii) বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই বাংলাদেশে **কৃষিনির্ভর শিল্পায়নের** যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

(iii) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি, শিল্পাঞ্চল গঠন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে শুল্ক বাধা রহিতকরণসহ **উন্নয়নমুখী নানা পদক্ষেপ** গ্রহণ করছে।

(iv) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রেও **দক্ষতা বৃদ্ধির** মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

(v) শ্রম বাজার অনুসন্ধান, সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অদক্ষ, আধাদক্ষ, দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করে; বাংলাদেশের সস্তা **শ্রমবাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ** করে জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

(vi) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন বা বিকাশের জন্য উন্নত দেশসমূহ হতে **মূলধনী দ্রব্য** (Capital Goods) আমদানি করতে পারে।

(vii) বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সোনালী আঁশ নামে পরিচিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বা **পরিবেশবান্ধব পণ্যের বাজার** সম্প্রসারণের সুবিধা বিদ্যমান।

* বা. অর্থ. সমীক্ষা ২০১৭।

(viii) শ্রমবহুল বাংলাদেশের সস্তা শ্রম ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরী পোশাকের বিশ্ব বাজার অনেক সম্ভাবনাময় এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিশ্বে এটি একটি **ব্রান্ডিং** হতে পারে।

(ix) সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্পকে আরো বিকশিত করতে হলে এ শিল্পে ব্যবহৃত তুলা, সুতা, বস্ত্র তথা ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড লিংকেজ **শিল্পের বিকাশ সাধন** করার সুযোগ রয়েছে।

(x) ভবিষ্যৎ সময়ের চাহিদার আলোকে **কাঠামোগত রূপান্তরের** মাধ্যমে উদার শিল্পনীতি-২০১০ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পের অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বেকারত্ব হ্রাসসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে।

(xi) সরকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, জ্বালানি, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেই **দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি** এবং তা বাস্তবায়নে **স্বল্পমেয়াদি** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে।

(xii) **প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ** বাংলাদেশের স্থলভাগ, অগভীর ও গভীর সমুদ্রাঞ্চল। রয়েছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর। নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসবই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

(xiii) ভারত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, চীনসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সাথে **যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে**, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি ও শিল্পখাতে প্রভূত উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

(xiv) বাংলাদেশে **প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ** (FDI) আকর্ষিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। সহজলভ্য, সস্তা উৎপাদনের উপকরণের সাথে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এ সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পাবে বলা যায়।

(xv) **পর্যটন সুবিধা** প্রাপ্তির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি কুয়াকাটা ও রাঙামাটি, বিশ্বের অন্যতম প্রধান ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রাচীন নিদর্শনের কারণে এখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন সম্ভব।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং উন্নত প্রযুক্তি আহরণে বিশ্বায়নের সুযোগকে বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিশেণ্ঢষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে ‘প্রবৃদ্ধি’ শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ অধিক। প্রবৃদ্ধি বলতে অর্থনীতির যে কোনো একক, উপখাত বা সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের হারকে নির্দেশ করে।
- অর্থনৈতিক মন্দার সময় পণ্যদ্রব্যের দাম হ্রাস পেতে থাকে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরÑ

ক) আয়তন খ) ভৌগোলিক অবস্থান গ) জনসংখ্যা ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য

২। সাম্প্রতিককালে বেশির ভাগ সময় বাংলাদেশের GDP কত শতাংশ ছিল?

ক) ৫.৩ খ) ৫.৭ গ) ৬.০ ঘ) ৬ এর অধিক

৩। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়Ñ

i. অধিক বাণিজ্য

ii. অধিক কর্মসংস্থান

iii. জীবনের মানোন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলÑ

i. উন্নত দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস

ii. বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি

iii. পণ্যমূলের ক্রম উর্ধ্বগতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মন্দার দিকে ধাবিত হলেও X দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিগত প্রায় এক দশক যাবৎ ৬% এর অধিক। X দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও বিনিয়োগ ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো, শক্তি ও জ্বালানী সম্পদের উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

৫। X দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান কোনটি?

ক) পূঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি খ) অর্থনৈতিক মন্দা শুরু

গ) অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন ঘ) জ্বালানী সমস্যায় আক্রান্ত

৬। উদ্দীপকে ‘প্রচেষ্টা’ শব্দটি নিম্নে কোন লাইনের সাথে ভাবগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক) বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান

খ) বাংলাদেশ মূলধনী দ্রব্য স্বল্প পরিমাণে আমদানি করে

গ) প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে

ঘ) শিল্পের বিকাশ সাধন অসম্ভব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ধারা নিম্নরূপ :

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)		
	১৯৯০-৯১	২০০০-০১	২০১৩-১৪
কৃষি	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৫০
শিল্প	২১.০৪	২৬.২০	২৯.৫৫
সেবা	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৩.৯৫

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ১৯৯৭, ২০১৫

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ কি? ১

খ) ‘বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশÑব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ সালে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দন্ডচিত্রে দেখান। ৩

ঘ) “বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষিনির্ভর নয়।”Ñউদ্দীপকের ভিত্তিতে বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের কারণে এদেশের অর্থনীতি ছিল অনুন্নত। কৃষি অনুন্নতি, শিল্পের পশ্চাৎপদতা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, জনাধিক্যের কারণে বেকারত্ব ছিল অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার বাস্তবমুখী নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে বিশ্বায়নের সুফল এদেশের জনগণ পেতে শুরু করেছে। আশা করা যায় রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

ক) বাংলাদেশের মোট সীমানা কত কিলোমিটার? ১

খ) মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৩

ঘ) তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।Ñউদ্দীপক হতে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

৩। প্রায় ত্রিশ বছর আগে মি. জসিম লেখাপড়া শেষ করে কানাডা চলে যান। তৎসময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নেতিবাচক। একটানা ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে তিনি অবাক। আগের বাংলাদেশ আর নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। মি. জসিম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দেশেই অবস্থান করবেন এবং অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামোÑব্যাখ্যা করুন। ২

গ) বাংলাদেশ কী একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দিন। ৪

৪। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অধিককাল ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের হাত থেকে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে এবং অর্থনীতির বেশ কিছু সূচকে যেমনÑকৃষি উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদেরকে আশাবাদী করেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ অতি শীঘ্রই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

ক) অর্থনৈতিক অবকাঠামো কী? ১

খ) “বাংলাদেশের মাটি শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক”Ñব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত অর্থনৈতিক সূচকগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উল্লেখিত অর্থনৈতিক সূচক থেকে বলা যায় কী বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে? মূল্যায়ন করুন।৪

৫। বাংলাদেশ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। তখন ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পিছনে এ দেশের কাঁচামালের যোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারপর বাংলাদেশ প্রায় দুই যুগ পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশত তখনও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই কম অংশ উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ রাখত। এক সময় বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নেয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধি, শিক্ষা খাতে সাফল্য, সমুদ্র বিজয়, আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্জন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

ক) গ্রামীণ খাত কী? ১

খ) বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার কারণ কী? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণগুলো নির্ণয় করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?৪

উত্তরমালা

পাঠ ১.১:	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। খ	৫। ঘ	৬। খ	৭। গ	৮। খ	৯। খ
	১০। গ	১১। ক	১২। ক	১৩। খ	১৪। গ	১৫।খ			
পাঠ ১.২:	১। ক	২। ঘ	৩। গ	৪। খ	৫। খ	৬। খ	৭। গ	৮। ক	৯। খ
	১০। ঘ	১১। ক	১২। গ	১৩। খ	১৪। ক	১৫। ঘ	১৬। গ	১৭। গ	১৮। ঘ
	১৯। ঘ								
পাঠ ১.৩:	১। ঘ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। খ	৬। গ	৭। খ	৮। গ	৯। ঘ
	১০। খ	১১। ক	১২। গ	১৩। গ	১৪। গ	১৫। ঘ			
পাঠ ১.৪:	১। খ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ	৫। ক	৬। ক	৭।		